বিহারের সাম্প্রতিক বাঙলা কবিতা

প্রবাসজীবন চৌধুরী

বিশ্বজোড়া ছন্নছাড়া জীবনকে দেখে

কোথাও সমুদ্র-কূলে···পেরু কিংবা কাপ্রি হতে পারে—
নৃত্যশালে রাত চলে···ক্লান্তি জমে আনাচে কানাচে,
চোখে কালি, কষ্ট হাসি, রংচটা ঘুণধরা হাড়ে।
··ভূতের মতন এক মস্ত চাঁদ কালোজলে নাচে··· !

বাজনা থামে না তবু—মরে গিয়ে ভূত হয়ে বাজে···
বাতাস লাফিয়ে ওঠে, কোথা যেন কুকুর-লড়াই ;
আবার একটু থামা···তারপর দরকারী কাজে—
দুইটি মাতাল মাতে—পুরাতন নালিশ-সাফাই··· !

ছেলেটা ঘুমিয়ে আছে   সারাদিন কিছু তো খেয়েছে ?
মায়ের তার পাত্তা নেই—স্বপ্নে মাকে নানারূপে দেখে—
কখনো আদর পায়· অভিমানে সত্যি ও কেঁদেছে·
আবার মারও খায়, জেগে উঠে একা বসে থাকে।

সমস্ত গুলিয়ে দিয়ে জাহাজের বাঁশি বেজে ওঠে—
তোলপাড় করে জল·· ঘূর্ণী-আলো দিকে দিকে ছোটে ॥

(সাদার্ণ ক্যালিফোর্ণিয়া ১৯৫৯)

—

সার্থক যাত্রা

শাপবিদ্ধ হরিণীর দুই চোখ, ঝরা নুড়ি কতো—
এ জীবনে ভেসে ওঠে, মণিমুক্তো এখানে সেখানে
শামুক ঝিনুক মাঝে, মেয়েদের সাজ মনোমতো—
নরম হিসাবী হাসি—পরিপাটি কথা কানে কানে।

ছবি ভেঙে ভেঙে চলি—বিচিত্রের পসরা ফুরায়—
ক্লান্ত চোখ দেখে সেই ফিরে ফিরে পুরানো বাহার,
কতো দূর···কতো দূর! সুষুপ্তির শয়ন বিছায়—
স্নিগ্ধ রাতে চিত্ত যেথা—মুছে যায় সমস্ত বিকার!

সহসা চমক জাগে—সন্ধ্যাকাশে আঁকা হেম-ভাল···
লঘুরেখা কয়েকটি, চোখ দুটি অর্ধ নিমীলিত
যুগান্তের বেদনায় সমাহিত; সাগর উত্তাল
মরুপ্রান্ত স্মৃতিভারে—ধ্যানমগ্ন অতীত আবৃত।

নিবিড় কুন্তলরাশি, তার মাঝে মুখ আমি ঢাকি'—
সুতীব্র নির্বাণ-সুখ; এ-যাত্রার কিছু নয় ফাঁকি।

—

সুধীর করণ

(১৯২৪)

শিকার

শিকারী নৌকোরা—

অন্ধকারে ব'সে আছে।

স্তব্ধ নিস্তরঙ্গ নদী—

পশ্চিমের বালুচরে ঘনিষ্ঠ সলিল।

পুবদিকে উঁচু পাড়,

পথ চলতে লো'কে

একবার নদী দেখে

একবার শিকারী নৌকোকে।

এখানে ওখানে তীক্ষ্ণ লণ্ঠনের চোখ

স্থির হ'য়ে, বাঁশপাতা মাছ

কিংবা কোন রূপালী পুচ্ছের

সন্তরণ খোঁজে।

বাজারে টাট্‌কা দামে ঠাণ্ডা রক্ত

জেলের চুবড়ীতে

সকালে বিকোবে তাই—

আত্‌রাইর অন্ধকারে

শিকারী নৌকোরা বসে আছে।

ক্ষুধিত লণ্ঠন চোখে

সারা রাত জেগে

লুণ্ঠন চালাবে।

কেউ কোথা জেগে নেই

কেউ কোথা কোন পৃথিবীতে,

এবং
সর্বত্র অন্ধ
অন্ধকারে লোভ জেগে আছে।

—

পত্রপুট

আকাশ আমার বহ্নিমান্
চিতার আগুন,
কোন্ স্বপ্নের চূর্ণ রেণু
গায়ে মাখবো !

তোমার চোখে চোখ রাখা দায়
অসম্ভবই ;
চোখের পাতা বন্ধ ক'রে
পত্রপুটে স্বপ্ন ঢাকি।

—

মৃত শ্মশানের দাগ

সঞ্চিত বিক্ষোভ নিয়ে
বহ্নিমান অরণ্যের বাহু,—
চতুর্দিকে লেলিহান শিখা।

সব পুড়ে ভস্ম হয়—

কান্তিবান হরিণ শাবক
হিংস্রক শার্দুল চিতা
বৃক্ষশাখে টিয়া হরিয়াল
পুড়তে পুড়তে কুৎসিত অঙ্গার।
মৃত শ্মশানের দাগ
অরণ্যের নিকষে চিহ্নিত।

আপাততঃ কিছু নেই,
কেউ বোনে শূন্য ত্রাস বীজ
কেউ বা অঘোরপন্থী ঘোর কাপালিক।

—

ভেল্‌কী

ভেবেছিলুম, ডুগডুগি বাজালেই
ভেল্‌কী লেগে যাবে।
ভেবেছিলুম, আঁটি পুঁতলেই
আম ধরবে গাছে,
ভেবেছিলুম, খেলা দেখে
তাক্ লেগে যাবে—
ভিরমি খাবে তাবৎ দর্শক।
মরাগাছে ফুল ফুটবে
শুক্‌নো খাতে জলস্রোত।
বন্ধ্যা মেয়ের গর্ভে সন্তান
মরুভূমি সবুজে শ্যামল।

ভেবেছিলুম, মাদারি সেজে

ভালুক আর বাঁদরের নাচ দেখাবো
কিংবা—
চুম্বকপাথর দিয়ে বিষ কেড়ে দেবো।

তারপর—
দর্শকদের কাছে হাতজোড় করে বলবো
এ সবই মা মনসার দয়া
হাড়ি ঝি চণ্ডীর আজ্ঞা—
ফুস্, ফুস্, ফুস্, ফুস্,—
নাগ্, ভেল্কী নাগ্।

—

বাসন্তীকুমার মুখোপাধ্যায়

ঘুমের ভিতরে

ঘুমের ভিতরে কার বাড়ি
জানলার কাঁচে মৃদু আলো
আলোর পিছনে ছায়া
ছায়ার আড়ালে মুখ, রহস্যের মতো তার
এলোমেলো আলোছালো শাড়ি :
প্রণয়ে অসুখী কোনো নারী···
ঘুমের ভিতরে
ঘুমের ভিতরে কার বাড়ি ?

ট্রেনের কামরায় বন্দী
উত্তরে হাওয়ায় ঝড় হাহাকার করে
দামাল বৃষ্টির ফোঁটা ঢুকে পড়ে, ঢুকে পড়তে চায়
বেসামাল বুকের ভিতরে।
শব্দের ভিতরে গন্ধ, গন্ধের ভিতরে ছায়া
ছায়ার আড়ালে দৃশ্যাবলী···
জানালার কাঁচে ঘ'ষে
চেনা ও অচেনা কত স্টেশনের নাম মুছে যায়
মাঝরাতে আলো জ্বেলে
শেষ ট্রেন চলেছে কোথায় ?
দরজায় হাত রেখে কোথাও দাঁড়িয়ে থাকে
এলোমেলো অগোছালো
প্রণয়ে অসুখী কোনো নারী···

ঘুমের ভিতরে
ঘুমের ভিতরে কার বাড়ি ?

—

পাথর কুড়োয় বীজ

পাথর কুড়োয় বীজ, কালো মেঘে জল,
জ্যোৎস্নায় আহত নেকড়ে পাখির কঙ্কাল নিয়ে
চিকন বালিতে খেলা করে,
প্রাচীন অনল তার পিছনের অদৃশ্য দেয়াল
যা' কেবল ক্রমান্বয়ে কাছে আসে
দূরে স'রে যায়।

শহরের টাওয়ারের নিচে
স্তূপীকৃত হ'তে থাকে মানুষের শব
তারা চোখ মেলে দেয় আকাশের দিকে
টাওয়ারের ঘড়িদের দেখে আর ভাবে
ভেবে ভেবে অবসন্ন হয়
ওরা কেন ঐখানে সবার উপরে থাকে
ওরা যদি ঠিকমত না রাখে সময়।

কোথাও স্বর্গের আছে বিষণ্ণ বেলাভূমি
সেখানে জীবন
অভিমন্যুর মতো কেবল প্রবেশ-পথ জানে
নিষ্ক্রমণের পথ এখনো জানে না,
রক্তের ভিতরে ফোটে বিশালাক্ষী বেদনার ভয়
অমোঘ মৃত্যুর ক্যামেলিয়া :

আহত স্নায়ুর চোখে আমি
বাঁকা-জলে শাঁখা-ভাঙা হাতের নির্জন অন্ধকারে
অন্যপারে কী রয়েছে দেখতে শুধু চাই
এবং শুনতে চাই পাথরের কণ্ঠস্বর
যা' কেবল আঘাত ও প্রত্যাঘাতে বাজে।

—

গোপন গোলাপ

গোপন গোলাপ বুঝি ফুটেছে বাগানে
অথবা বাগানে নয় অন্য কোথাও
হয়তো উঠোনে কিংবা উঠোনেও নয়
অন্য কোনোখানে কিংবা কোথায় কে জানে
গোপন গোলাপ বুঝি ফুটেছে বাগানে।
ঝাপসা চোখের দৃষ্টি হদিশ জানে না
মিষ্টি গন্ধ শুধু মন-কেমন-করা
অন্ধকারে ভেসে আসে বুকের বাতাসে
সেই গন্ধে চুল মাজে, খোঁপা বাঁধে কবেকার বসন্তসেনা।

হয়তো গোলাপ নেই, চোখে তো দেখি না
বোধ হয় লুকিয়ে আছে পাতার আড়ালে
আগাছার জঙ্গলে ঢেকে গেছে গোলাপের চারা,
হয়তো গোলাপ নেই,
আছে শুধু গোলাপের গোপন ইশারা।

মৃত আকাঙ্ক্ষার হাতে হাত রেখে জানালার পাশে
অন্যমনস্ক হ'য়ে যখন দাঁড়াই

ঘুমের ভিতরে ক্লান্ত জাগার বিস্ময়ে
যখন নিজেকে খুঁজে পাই
মুখ মুছে জীবনের ধূসর আঁচলে
খাতা বাসনার গাঢ় রঙ
ফিকে হ'য়ে লেগে থাকে বিকেলের ঠোঁটে
জোনাকিরা এলোমেলো কথা ব'লে চলে
তখন হঠাৎ—তখনই হঠাৎ বিস্ফোরণ :
সমস্ত শরীর জুড়ে
অনাবহ সৌন্দর্যের রক্তের ভিতরে
অজস্র গোলাপ ফুটে ওঠে।

—

গুরুদাস মুখোপাধ্যায়

হানা

'হ'চ্ছে'র জগতে 'হ'য়েছিল' হানা দেয়।
বারোলাখ আলোর বছর আগে যে তারা নিবে গেছে
তার আলো আজও পৃথিবীতে এসে পৌছয়।
বারো বছর আগে অনুভূতি যে ঢেউ তুলেছিল
তা আজকে স্নায়ুর শ্যাওলায় চঞ্চলতা আনে।
কত কী যে হ'য়েছিল, কত কী যে হয়নি,
'হ'চ্ছে'র জগতে তারা সব থেকে থেকে হানা দেয়।

—

সত্যেন্দ্র দে

জননী

মাটির আত্মার কাছে আমি এত ঋণী—
কখনো ভাবিনি।
সোনার হলুদ এই মুঠিভরা লবণাক্ত ধূলি
সবুজে শ্যামলে আর প্রাণবন্যাবেগে হোলো কর্ণফুলি।
কখনো বুঝিনি এই রক্তঝরা স্পন্দনের তালে
মরু-হৃদয়ের রঙ ফুল হবে আশ্চর্য সকালে,
জানি না কখন কোন্ অরণ্যের গন্ধমাটি হাতে
পাষাণে স্ফুলিঙ্গ এলো আঘাতে আঘাতে
মাটির বেহালা থেকে বাষ্প হ'য়ে সে সুরের মেঘ
কখনো নীড়ের বৃন্তে এত স্নেহে ভরেনি উদ্বেগ
মাটির আত্মার কাছে আমি এত ঋণী—
কখনো ভাবিনি।

কখনো ভাবিনি—
শোণিতে হয়নি শেষ মা তোমার সব নিকিকিনি।
অনেক মানুষ, মন, মধুময় মিলনের তৃষা
তরুণী পৃথিবী হোলো কতবার রাত্রির বিদিশা।
সেইসব ভালোবাসি, ভালো লাগে দুই হাত ভ'রে
যখন দিয়েছো দান পূবাশার মাহেন্দ্র প্রহরে
এই ধূলি দূর্বামুঠি ভস্মবাষ্পতে একদিন
আমার পাণ্ডুর রঙ ঢেকে দেবে প্রশান্ত নবীন,
তখন তোমার অশ্রু শিশিরের মুক্তোবিন্দু থেকে

স্মৃতিগন্ধ নিয়ে যাবে এরা ওরা আরও অনেকে
মাটির আত্মার কাছে আমি এত ঋণী—
কখনো ভাবিনি।

কখনো ভাবিনি—
আরো যে চেনার আছে মা তোমায় যতটুকু চিনি,
তার চেয়ে বড়ো স্বর্গে নিতে হবে অগ্নি অঙ্গীকার
আকাশের মুঠো খুলে পেয়েছি তোমারি উপহার
ঘাসের জাজিমে দেখি তোমারি পায়ের আল্‌পনা
মাটির প্রদীপ থেকে আলোর প্রণামী এক কণা
এমন ডানার ছায়া তোমার নিবিড় দিয়ে ঘেরা
সূর্য ছিঁড়ে আনে বুঝি জোনাকের মতো পতঙ্গেরা।
ভালবাসি মা তোমার সমুদ্র-পাখির দুই চোখ
ওখানে বুকের কাছে আমার মৃত্যু হয় হোক।
মাটির আত্মার কাছে আমি এত ঋণী—
কখনো ভাবিনি।

—

চক্রব্যূহ

বদ্ধগলির মুখে কৃপণ আকাশ নিষ্কৃতির কোনো রন্ধ্র নেই
কঠিন চক্রব্যূহ লোহার বাসর সূর্য হারালো তার খেই
পাতালে অনেক ঋতু তবুও জল্লাদ অনিদ্র থাবা মেলে আছে
অভিমন্যু ফিরে এসো এখনো সময় অভিমানী আত্মার কাছে।

পৃথিবীর ঘুণধরা বিষণ্ণ পাঁজরে কি ক'রে বজ্র গড়ি বলো
প্রেতের মিছিল চলে তারি হাত ধরে না হয় সুড়ঙ্গে ফিরি চলো

আমার ভঙ্গুর কাঁধে কার মৃতদেহ জয়ে মুখ এখনো দেখিনি
প্রত্যেক প্রত্যুষে তবু এই বিড়ম্বিত বিবেকের মুখ আমি চিনি।

সিন্ধুসারস তার ডানার সুবাস আকাশে বিছিয়ে পায়ে পায়ে
মেঘভাঙা স্বর্ণালী পূর্বাশার নামে ফিরে আসে মৃত্তিকার দাবে
তবুও সপ্তরথী দুর্মর পাহারা মুক্তির ঘ্রাণ আসে পাছে
অভিমন্যু ফিরে এসো এখনো সময় অভিমানী আত্মার কাছে।

তুমি বলো অভিমন্যু এই ব্যূহ ভেঙে পরিত্রাণ সম্ভব নয়
আমি জানি কণ্ঠস্বরে স্ফুলিঙ্গের তাপ তাই তো মানি না পরাজয়
ভস্মপুতুল ছাখো স্পন্দনের আয়ু অগ্নিগিরি সোচ্চার হোলো
পাথুরে মুঠির বজ্রে নির্মম চাবুক বঞ্চকের বজ্রমুঠি খোলো।

আমি জানি অভিমন্যু উদ্ধার নিশ্চিত ব্রাত্য আর নিস্তব্ধ হবে না
ঘাতকের রক্তমাখা পাঞ্জা ভেঙে দেবে প্রতি রক্তবিন্দুর দেনা
ঘামের বাষ্প মেখে ঘুমন্ত শপথ মৃত্যুর বিনিময়ে বাঁচে
অভিমন্যু মনে রেখো এখনি সময় দীক্ষা নাও সাগ্নিকের কাছে।

—

সান্নিধ্য

তোমার অনামিকার রক্ত প্রবালের মতো
আমার চন্দ্রমল্লিকার বনে একটি অশোকের জন্ম হয়েছিল :
আমার প্রণয়ের রঙ সাত সকালের মৌরী ফুলের মতো
কাঁচা সোনায় ঝলমলিয়ে উঠেছিল তখনি।
এখনি তোমার চোখে অনেক সমুদ্র।
আর নির্জন নাবিকের ভরাডুবির ইতিহাস।

তোমার লাজুক কঙ্কণের একটু আঘাতে
তোমার ভুবশঙ্খ মাটির উত্তাপে আমার সমস্ত অহংকার
ছিন্নমূল শ্বেতকরবীর মতো প্রণাম হ'য়ে ঝরে পড়েছিল।
আমি রোদজ্বলা আকাশের নীচে
রক্তে ঘামে শপথ করেছিলাম—
আরক্ত কপোলে অনুরাগের মুক্তাবিন্দু।
তোমার কুন্তল কবরীতে তখন আদিম রাতের মোহগন্ধ
যুগল মেরুর বক্ষ দোলাচলে পাহাড়ী যুবতীর নিষ্পাপ সম্ভ্রম।

আমার মেঘ-সঙ্গী প্রণয়ের রঙ
প্রথম গোধূলির করুণ কপোতের মতো
সন্নমে সংলাপে পথ চেয়েছিল
তোমার নগ্ন বাসনার অচেনা স্বর্গে।
আর তখনি কবিতা হয়েছে রূপকথা।
গান পদাবলী আর ইচ্ছে আরবী ঘোড়ার মতো দুরন্ত সুখী।
তখনি ঝিনুক-ফোটা নীলাঞ্জনা রোমাঞ্চ আলোর মুখ দেখেছে
ঘাসফুলে ভোরের পতঙ্গ, রজস্বলা মাটিতে অঙ্কুরের আত্মপ্রকাশ।
তখনি স্বাতী, শ্রবণা, শতভিষা
আরো অনেক নক্ষত্র নীহারিকার নীচে প্রথম মানবীর মুগ্ধ আবেশে
এক বন্ধনকামী অমৃত-পুরুষ হিরণ্যগর্ভের কাছে প্রার্থনা করেছে—
দুটি নদীর সঙ্গমে এক অপাপবিদ্ধ উত্তরসূরী।

—

সত্য কুণ্ডু

অনেক কলকণ্ঠ, চিৎকার
আগুন আগুন হয়ে
আগুনের অন্ধকারে
ছিন্নমূল !
একটু মাটির গন্ধ, আলো
কোথাও জ্বলে উঠলো না !

অনেক কান্না, ভালোবাসা
পাথর পাথর হয়ে
পাথরের অরণ্য
কোনো দেবীপ্রসাদের আশায়
মূক মূঢ় !
ছেনির আঘাত—
কোন একটি সচল শরীরের ছন্দে দুলে উঠলো না !

রক্তের ঘামের আর—
নিঃশ্বাসের ধোঁয়া থেকে
শান্তির ছাই থেকে
কয়েকটা অক্ষর
কোন মতে
পালিয়ে পালিয়ে পালিয়ে

নিজের আয়নার সামনেই
হা হতবাক !

হায়—
সে যে লজ্জা—
তাই উচ্চারিত হ'লো না !

—

আমার মৃত্যু : কালো গোলাপ
[ডঃ মার্টিন কিং লুথারের মৃত্যুতে]

আমি নিজে নিজেকে হত্যা করলাম।
আমি নিজে অনেকগুলি অংশে
অনেকগুলি সত্তায়—
দিকে দিগন্তরে ছড়িয়ে দিলাম।
অথচ প্রতিটি সত্তা তার আপন বৈশিষ্ট্যে
মাটি থেকে জীবনের রস নিয়ে
সূর্য থেকে প্রাণের প্রাচুর্য নিয়ে
ফুল হয়ে উঠল না !

আমি নিজে নিজেকে হত্যা করলাম।
আমার প্রতিটি সত্তার অভ্রংলিহ স্পর্দ্ধা
আজ অনেক বিরোধে
বাগানের প্রতিটি ফুলের
স্বতন্ত্র মাধুর্যকে
সত্য শিব সুন্দরের উদ্দেশ্যে
নিবেদন করলে না
অথচ একদিন শুধু কালো গোলাপের স্বপ্নে

যশোদাজীবন ভট্টাচার্য

শেষ প্রহর

এখনো তার পায়ের ছোঁয়া
লাগেনি ঘাটে,
কাঁপেনি জল, রাঙেনি,
ভাঙেনি ঘুম, ডাকেনি পাখি,
আকাশে শুক—
তারার চোখ নাবেনি।

এখন শুধু যে যার ঘরে অবাধে
এঁটেছে খিল ঘুমের কালো কবাটে,
এখন সেই পুরনো গ্রাম প্রবাদে
সবার মুখে ছড়ায়, ঘোরে ক্ষেপাটে।

এখনো ভালো লাগেনি তারে
বাসেনি ভালো
জ্বলেনি আলো, হাসেনি,
মাতেনি শাখা, জাগেনি সুর,
ফোটেনি ফুল,
বাতাসে বন ভাসেনি!

এখন হিম-হাওয়ার হু-হু শূন্যে

শিশির তবু শব্দহীন আভাসে
মাতায় মাঠ মননশীল পুণ্যে—
আঘন বুঝি প্রণয় আনে প্রভাসে।

—

স্বর্ণসেতু

তপ্ত সূর্য ডুবলো সান্দ্র আকাশে
বিলাসী মেঘেরা মৌতাতে মদমত্ত—
ছিন্ন আলোর কাঁচুলী

কী জানি কী আছে
চাওয়া, না-চাওয়ার হাওয়ার অন্ধকারে।

অযথা মনের দ্বন্দ্ব-মধুর স্বর্গে
বরাহ তিমির হানা দেয় অসতর্কে—
অন্ধকার কি আলোর ফলশ্রুতি ?

হঠাৎ হাওয়ার হস্তাবলেপে বস্ত্র
ছায়ারা কাঁপলো রেশমী আলোর আভাতে—
বুঝি বৃকোদর দুঃশাসনের রক্তে
ব্যগ্র দু'হাতে বেণীবন্ধনে ব্যস্ত—
বল পাঞ্চালী, মিটেছে প্রাণের তৃষ্ণা ?

কিন্তু কী হবে আলোর ইন্দ্রপ্রস্থে
যদি শ্মশানেই মগ্ন সোনার বাংলা !

তবে কি এবার
মহাপ্রস্থানে জীবনের যতি মানবো ?
জানবো যে ছিল
শত্রু কিংবা মিত্র কিংবা কিছু না—
আজ তারা নেই—
কী করে সে ব্যথা ভুলবো ?

রন্ধ্রবিহীন অন্ধকারের পারে
মাথা কুটে মরে লক্ষ লক্ষ আশা ;
আমি অবিকল জিজ্ঞাসা করি : কবে
অন্ধকারের বুকে বেঁধে দেবে আলোর স্বর্ণসেতু--

আমি মৃত্যুকে পার হব বল কবে ?

—

উতল বসন্ত

ছায়া-কাঁপা ভীরু আমলকী বন
পেরিয়ে পুকুর জর্দা বরণ,
পরপারে সারি সারি নারিকেল,
বাতাবি গন্ধে হাওয়া উদ্বেল।
পশ্চিমে মাঠ সীমানা বিহীন,
আকাশে চাঁদের আলো অমলিন।
শিমূলের ডালে তিতিরের স্বর,—
বুঝিনি সেদিন সে-ও নশ্বর।

আজ যৌবন, নাগরিক ক্ষণ

শোষ করে মন ; বিবিক্ত দিন।
রাতের আকাশ বেদনা-মৌন,
বন্দী চোখের সে ছবি গৌণ।

কান্তবাবুর কর্নেটে আর
বাজেনা সিন্ধু-বারোয়াঁ বাহার॥

—

গোপালহরি বন্দ্যোপাধ্যায়

(১৯৩৩)

ভাষা দাও তাকে

অচেনা নদীর তীরে হেমন্তের মন্থর বাতাসে
পাখালির পত্র-পুটে স্মৃতি যদি ফুটে ওঠে ভোরে
কিংবা রাঙা গোধূলিবেলায়—
কমলা মেঘের স্তূপে
ফার্নবনে পাখিদের গানে
বিদেশিনী সেই স্মৃতি—এক মুঠো ভালোবাসা শুধু
ভেসে আসে নরম পালকে,
আকাশের গাঢ় নীল বেদনার সাঁকো
পার হবো ব'লে
ময়ূরাক্ষী বাঁধ যেন স্নিগ্ধ আঁচলের ছায়া
জ্যোৎস্নার পাহাড় থেকে নামে
প্রত্যাশিত শুধু ভালোবাসা—
এ যে তার আধো-ফোটা মঞ্জরীর ভাষা।
এ-ভাষাকে ভাষা দাও চিত্রল হরিণী
ঘন জারুলের বনে
ময়ূরের পেখমের মতো,
স্মৃতি কি অনেক পথ পাড়ি দিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়ে ?
শুশ্রূষার জল দাও নদী,
সবুজ ঘাসের মাঠে আজিমের এলানো বিশ্রাম।
অনবকাশের ফাঁকে কথাহীন সেই ভাষা
অনুভবে এনে দিক সূর্যমুখী আলোর প্রত্যাশা।

—

অধরা

[illegible]

বৃষ্টির ওপারে মুখ
ঝরো-ঝরো বেদনার মতো
আধো-চেনা গাঢ় অনুভবে
দুহাতের করপুটে আকাঙ্ক্ষার নীল পদ্ম
গাঢ়তর হবে—সে যে চির-উর্বশীর মতো
ইথারের প্রাণপুঞ্জে অধরা মঞ্জরী।
দক্ষিণের খোলা জানালার ধারে
মাঝ রাতে বেহালায়
দরবারী কানাড়ার রেশ
ভেসে এলে
কিংবা কোনো দূর স্মৃতি কাঁঠালী চাঁপার গন্ধে
উতলা আকাশে হৃদয়ের রাজধানী
বলে—'ভালোবাসো'।
সঙ্গীহীন ত্রিযামা প্রহরে
প্রিয়তম চিঠিখানি লিখে যাবো
শব্দের গভীরে শব্দ,
সুমেরুর কুমারী তুষারে
অনাঘ্রাত নিহিত ব্যঞ্জনা.
অতলান্ত সাগরের বুক থেকে
প্রবাল কুড়োনো,
যদি তার ছোঁয়া মেলে—এতোটুকু দাও,
আষাঢ়ের করিডরে মুখ রাখি
অবিশ্রান্ত বৃষ্টির কপোলে
যদি তার ওপারের কণাটুকু পাই।
ভালোবাসা—সে তো উর্বশীর মতো
কাঙ্ক্ষিত হৃদয়ে
অনন্তকালের রাজধানী!

আরণ্যক

অয়াল মাটির নীচে
লাভার মোচড়ে বিস্ফোরণ
নাকাড়ায় ঘুম-ভাঙ্গা রাত্রির গভীরে
ভূমিকম্পে গুম্-গুম্ নিথর সিংভূম।
রক্তমুখী পলাশের দাউ-দাউ আগুনের শিখা
দাবানলে জ্বলে ওঠে সারান্দার বন।
নিষাদের ব্যারিকেড শঙ্খচূড় তীরে
গর্জে ওঠে অভিশপ্ত রাগে
মহুয়া-মাতাল সন্ধ্যা বজ্রমুঠি ধরে
প্রত্যয়ে উত্তাল ;
সে কি শুধু মাটির বন্দনা—
নির্বিচার গাছ-কাটা কুঠারে-সমিধে
আত্মঘাতী খাণ্ডব দাহন।
সে-চর্যার আরণ্যক স্রোতে
শমীবৃক্ষে ঘুমন্ত আয়ুধে
জেগে ওঠে সব্যসাচী-প্রাণ !

—

রোহিণীকুমার দাশ

(১৯৩৩)

ওর

স্ফুটন্ত ফুলের পাপড়ি ওর মন
কিংবা নরম খসে পড়া পালকের মতো,
চিরদিন নিঃসঙ্গ অচেনা
অথচ এ পৃথিবীর সব শব্দ
সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা
ভরে আছে চলমান শোণিতের নদী।

সূর্যের সকল তাপ শুষে নিয়ে
ছায়া দেয় পৃথিবীকে নীরব বৃক্ষেরা
যুগের যন্ত্রণা পিঠে ক্লান্তদেহ স্বপ্নের শরীর
পথ হাঁটে পথ হাঁটে হাজার বছর
মানুষের সমস্যার লেনের ভিতর।

প্রাণে ওর প্রত্যাশার কোন রঙ নেই
এ মাটির সমষ্টির ইচ্ছার লণ্ঠন
সঙ্গে নিয়ে ফেরে দেশে দেশে
ঘুমোয় পথের পাশে মাথা রেখে ব্যথার বালিশে

—

পোশাক

যতবার বাইরে যায় পোশাক পাল্টায় রাত্রু
তুমি বড় উত্তেজিত—
কিন্তু ওকে কি হবে শাসনে !
ভেবে ছাখ তুমি আমি দুজনেই পাল্টাচ্ছি পোশাক
ঘরে কি বাইরে
নানান রঙের ছবি ক্ষণে ক্ষণে তুলির আঁচড়
পোশাকের বৈচিত্র্যেই সংস্কৃতি আজ আধুনিকা,
কাব্য সেও শব্দের ঘাঘরায় ।
হাসি-কান্না, দুঃখ-শোক
আলো আর ছায়ার পোশাক
প্রয়োজনে গায়ে দিয়ে ভিড়ে মিশে এক হয়ে যাই ।
সমস্ত পৃথিবী জুড়ে পোশাকের রঙের মিছিল
পাল্টে যাচ্ছে রাজনীতি অর্থনীতি
সাম্রাজ্যের ইজিমের ভিত্—
রাত্রু তারই প্রতিবিম্ব,
তুমি বড় উত্তেজিত
ওকে আর কি হবে শাসনে !

—

বিকারহীন নৈঃশব্দ্য

গতকালও ওর কিন্তু পুজো হয়েছিল—
আলোর রোশনাইয়ে কত সেজেছিল
বাঁশী, কাঁসি, ঢোল ;
নানান বাহারী রঙ

রানীর মতন নাচ চুমকীর চমক
মাতামাতি করেছিল নারী ও পুরুষে—
কাল ওর পুজো হয়েছিল।
আজ কিন্তু মুখ থুবড়ে পড়ে আছে
মজে যাওয়া ডোবার কাদায়
ন্যাংটা এক ভিক্ষুকের মত
অসহায় অনাদরে জীর্ণ দিন বাঁশের কঙ্কাল

জন্মের প্রথমদিনে শঙ্খ বাজে
হয়ত বা আনন্দের হুলুধ্বনি ওঠে,
বিভিন্ন পোশাকে কাটে বহুদিন
মন্ত্রী, ভিক্ষু, নেতা, পিতা, সন্তান বা মস্তানের দলে;
প্রচণ্ড যৌনের ক্ষুধা ভাদ্রের কুকুর কুকুরী
যৌবনের চঞ্চলতা বার্ধক্যের ব্যর্থ হাহাকার—
সব অহংকার মেশে শূন্যগর্ভ মৃত্যুর আঁধারে
এক মুঠো শুধু ছাই :
অদ্ভুত মিথ্যার মাঝে অলৌকিক মোহের পাঁচিল।
রঙ বদলের পালা
সব রঙ এক হলে
শুধুই বিকারহীন নৈঃশব্দ্যের খেলা।

—

সমীর রায়চৌধুরী

(১৯৩৩)

তবুও এ-যন্ত্রণায়

একদিন সবকিছু হারাবে সে অশোক কপালে
হারাবে যূথীর মালা কল্পনার ছিন্নভিন্ন ডালে
ঘাসফড়িঙের রঙ মুছে নেবে শিশিরের জল
অথচ সবুজ তৃপ্তি পূর্ববৎ রাখা অবিচল ;
কল্যাণের চেয়ে বড়ো শৃঙ্খলিত নীরব কল্যাণী
উপনিষদের থেকে তুলে দেবে সুশোভন বাণী
বধির প্রান্তরে তবু পারাপারে বাতাস ছড়ায়ে
একদা রেখেছি শান্তি তীব্রতম সর্পাঘাত সয়ে।

সেই শান্তি পরিণামে যন্ত্রণার নির্মম প্রস্তর
আমাকেই লক্ষ্য করে ছুঁড়ে দেয় নির্লিপ্ত প্রখর ;
এতো হীন আত্মময় মানুষী দেখিনি—
কল্যাণের চেয়ে বড়ো শৃঙ্খলিত নীরব কল্যাণী।
তবুও এ-যন্ত্রণায় আমরণ প্রতীক্ষার দিকে

আমার যা কিছু লব্ধ দিয়ে যাবো প্রাক্‌গর্ভিণীকে।

—

ছবির কাছে নিবেদন

ছখানা পাপোশ, ঘড়া,
পবেচঁর,
সাতখানা বাড়ি
চশমা কিসের চাবি,
পাখিদের কই ঘরবাড়ি ?

তিনলক্ষ কৌতূহল বুকে লয়ে জেগে ওঠে, সন্তান আমার
আমাকে মুঠোয় ধরে ঘুরিবে সে বহু মহকুমা ;

ললিত রঙিন জামা
কেন পরো, প্রতিষেধ, কেন ল্যাম্পপোস্ট,
রেডিয়োর কথা কয় তিনটে বিনোবা ভাবে অতিকায় হলে,
মোমবাতি জলে যায় শালগ্রামে লাল জবা ফুলে ।
সিনেমা মাতাল ছবি,
শামিয়ানা, রুইতন জোড়া,
মিছিমিছি খেলা মঞ্চ, বড় হলে বোধগম্য ঘোড়া ।
প্রাচীন মগধ রাজ্যে একদা ছিলেন রাজা ধার্মিক অশোক—
ততটা মেধাবী নই, পঁচিশ হাজার স্বেচ্ছা বড়ো জোর করিয়াছি জড়ো,
কিয়ৎ শপথ আছে, তার চেয়ে আছে বেশি চাঁচা মিথ্যাচার,

কতিপয় তীর্থবাক্য জড়ো করে খেলিতেছি লুডো ।

—

হনির ভিতর দিয়ে দেখা যায়

জাহান্নমে যাক গ্রহ নক্ষত্রসমূহ ভেঙে পৃথিবীও যাক জাহান্নমে,
লাথি মেরে সব ভেঙে চুরমার করে দিলে কাল আমি সহাস্যবদনে
হাততালি দিয়ে মঞ্চে কোনরূপ গ্লানিহীন সুরেমবার্গের আদালতে
তুড়িমেরে কাঠগড়া গুঁড়িয়ে তোমাদেরও পারতাম ভেজিয়ে নিস্তারে।
সৌরমণ্ডলের পথে তছনছ পৃথিবীর অন্ধকার ফেরী আবর্তন
কোনরূপ রেখাপাত সম্ভব ছিলোনা গ্রহে হৃদয়ে যেথায়
আমার শরীর ঘিরে ইহুদির হিন্দুশিখমুসলিমের
আততায়ী আদর্শের ঘৃণ্য রক্তপাত—
আমাকেও জয়োল্লাস দিয়েছিলো মূত্রপাতে পোষা রাজনীতি।
তোমাদের আস্ফালনে বিনয়ী মুখোশ ঘিরে আমার হনির জন্মদিন
আমারই মুখোশ ধরে টান মেরে ছিঁড়ে ফেলে আর্ত চীৎকারে—
ধান উৎপন্ন হওয়ায় গন্ধ এখন পেয়েছি শুঁকে কৃষকের উর্বর শরীরে,
কুমারী মহিলাদের মসৃণ উজ্জ্বল দেহে বহুবার হাত রেখে উত্তর নিশীথে
পরাগ চমকে ওঠে, স্পর্শ করে নারীর সমগ্র দেহ জুড়ে
আশ্রয়ে ছড়ানো আছে প্রীত এক ধরনের মিহিরুখু বাল।
ক্রমে এই সমস্তই নাভির ভিতরে আনে রুদ্ধ আলোড়ন,
জেগে ওঠে মৃগনাভি, চেয়ার টেবিলে গ্রহে অম্লান মাঠের ভিতরে
ধু ধু রিক্ত প্রান্তরের দিকে শাবক প্রসব করে রঙিন প্রপাত,
চারিদিকে ফলপ্রসূ হয়ে গেছে রাশি রাশি প্রতিহারী ধান—

মনে হয় বহুক্ষণ মাঠে মাঠে গড়াগড়ি দিয়ে বিছানায় উঠে আসে নারী
ক্ষুধার্ত শিকড়গুলি ঢুকে যায় নীড় আস্বাদনে,
তখনই উৎপন্ন হওয়ার গন্ধ জাগে, কৃষকের উর্বর শরীরে।
ভূত আবছা আঁধারে আজ তাই বারংবার মনে হয় পৃথিবীর সহজ সুদিন
ফিরে এলে সুখাশান্তি,

আমার হনির জন্য তোমাদের কাছে আমি ঋণী চিরদিন।

—

শুভেন্দু পালিত

(১৯৩৪)

ইচ্ছে করে

আমার মাত্র দুখানি হাত—
ইচ্ছে করে : সে দুই হাতে
অন্ন বিলোই এই পৃথিবীর
নিরন্ন সব লোকের পাতে।

ভীষণ ভীড়ের ট্রেনে আমার
একটি মাত্র রিজার্ভড সীটে—
ইচ্ছে করে : দাঁড়ানো সব
লোককে বসাই কোলে পিঠে।

আমার মাত্র একটাই মুখ—
ইচ্ছে করে : তাকেই করি
লক্ষ লোকের মুখপাত্র,
হয় না কিছুই। লাজে ম'রি।

—

একুশে ফেব্রুয়ারির কবিতা

কে যাচ্ছো, ভাই, বাংলাদেশে ?
সামলে যেও !

৩

যাওয়ার সময় ডাইনে-বাঁয়ে,
সামনে চেয়ো।

রূপকথা নয়—
রক্তনদীর পাশে পাশে
তৈরি হ'লো হাড়ের পাহাড় কী বিশ্বাসে
বাংলাদেশে।
মাঠে-ঘাটে-রাজপথে আর
দরগা-ঠাকুরবাড়ির কাছে
মায়ের, ভায়ের, পারুল বোনের
রক্ত-স্মৃতি ছড়িয়ে আছে।
হয়তো তোমার পায়ের চাপেই
কাঁদবে মৃত শিশু আবার!
দেখে শুনে পথ চ'লো, ভাই,
রক্তনদী, হাড়ের পাহাড়।

টের পাওনি : শোকে তাপে
পদ্মা-মেঘনা উথাল-পাথাল,
দেখছো না কি : বাংলাদেশের
শ্যামলা মাটির
সবটুকু লাল,
শহীদ বেদী—সমস্তটাই!
সব তীর্থযাত্রা শেষে
কে এলে, ভাই, বাংলাদেশে?
নতশিরে দাঁড়াও আসি,
বলো : আমার সোনার বাংলা
আমি তোমায় ভালোবাসি।

মঞ্জুলী ঘোষ

(১৯৩৭)

অসংশয়

তুমি অন্ধকার করে রেখেছ ঘর,
এ অন্ধকার আমি মানি না।
এসো, হাত ধর।

অন্ধকারই সত্যি নয় শুধু।

অনবিগত থেকে যায় অনেক কিছু
অনেক কিছু অনন্ত হাওয়ার হাতে।—
চাঁদে ধোয়া অযুত রাত্রির আঁচলে
আঁধার ঢালবে,
এত তমসা তোমার নেভানো প্রদীপে
নেই।
এসো, হাত ধর।

নৌকোটা

নৌকোটা মেঘ দিয়ে গড়েছিলে
না বৃষ্টির ধারা দিয়ে,—
কিছুই বলোনি

ভাসতে ভাসতে দেখি,
সে কোথাও নেই।

নদীপারের হাঁটা শেষ হওয়া কঠিন।
এপার শেষ হলে পরে
        অন্য পার আছে ;
তারা সমুদ্রে নিয়ে যায়।
সেখানে দেখা হয়ে যাবে
        ক্ষ্যাপার সঙ্গে !
তার খোঁজ কখনও সারা হয় না !

নৌকোটা বা নিজেই গড়,
        স্বপ্নের বা সত্যিরই সে,
হাতে দিলে ভালো করতে।

এখন আমার খোঁজ
    সে নৌকোর খোঁজে
        আর একটা নৌকোর (খোঁজে)
            আবার একটা,
                আবার—

—

দেবব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

(১১৩৮)

রাতের গল্প

সন্ধ্যায় মেয়েটি যখন সংজ্ঞাহীন যন্ত্রণায়
বিষের শিশি সজোরে চেপে
আড়চোখে তাকিয়ে
দেখছিল দেয়ালে
একটা টিকটিকি
ওৎ পেতে এগোচ্ছে
এক নিশ্চিন্ত প্রজাপতির দিকে
বাইরে তখন ফাল্গুন হাওয়ায় কোকিলের স্বর মহুয়া-মদির।

মধ্যরাতে মেয়েটি যখন কান্নায় ক্লান্ত হয়ে
অসাড় আতঙ্কে শুয়ে ভাবছে
জমাট রক্ত থেঁতলানো শরীর মর্গ
নিরুপায় অন্ধকারে
প্রার্থনার কম্পিত আঙুল
ঝাঁক ঝাঁক মশা ঘরের অন্ধকার সঘন করেছে।

ভোরে মেয়েটি যখন হঠাৎ আশ্চর্য হ'ল
এত ঘন দীর্ঘ
সে ঘুমোলো কী ক'রে
আর ভাবলো কত যুগ কেটে গেছে
কান পেতে নবান্নের কাকের ডাকে
অমোঘ সর্বনাশের মতো শুন্‌ল দরজায় পরিচিত টোকা।

নিরুত্তাপ

সুদীর্ঘ অঙ্কের জাল
আনাচে কানাচে তার জটিল রহস্য
ধাপে ধাপে সন্তর্পণে পা ফেলে
শত গুণ-ভাগে কাটাকুটি ক'রে
সমাধানে নেমে আসা :

তবু একটি ছোট্ট উত্তর থেকে যাবে
তার নীচে যাওয়া অসম্ভব
তাই তাকেই সমাধান মেনে নিতে হবে
একটি ক্ষুদ্র কংক্রীট উত্তর
পাহাড়ী নদীর সব গতি রুখে দেবে :

সেইখানে নেমে এসে একবার ফিরে দেখো
নদীর বিচিত্র গতি কতো পথ পার হয়ে এল
তারপর মাটিতে কান পেতে শুনো
সে-উত্তরের নীচে নিরুত্তর প্রশ্ন এক স্তব্ধ হয়ে আছে
সপ্তর্ষির মতো নিঃশব্দ সঙ্গীতে :

বাঁচার উত্তরে নেমে জীবনের প্রশ্ন ছুঁয়ে যেও।

—

লিপি

প্রহর কাটে :
খড়কুটো, এটা ওটা,
ভালোলাগা, ঘৃণা,

খুঁটে খুঁটে খাওয়া,
কিছুক্ষণ রোদের বিলাস,
আর প্রতিক্ষণ
বুকের ভেতরে
অস্পষ্ট 'গেল-গেল' ডাক :
প্রহর গড়ায়—
অজান্তে রঙেরা পিছু হাটে,
লালের সকাল
কমলা হলুদ সিঁড়ি বেয়ে
ফিরে যায়
ভায়োলেট সন্ধ্যায়
পাখায় শিশির লাগে
যাবার বেলায় :

পড়ে থাকে একটি পালক
পরিপূর্ণ পরিচয়ে—
সেই লিপি গাঁথা হবে
আগামী সকালে
কিশোরীর প্রাকৃত খোঁপায়।

—

গৌরাঙ্গ সিকদার

(১১৩৮)

সন্ধ্যামুখী রোদ

আমি তুমি বা আমরা যারা
কপালের চন্দন ঘামের সাথে মুছে ফেললাম
তাদের পায়ের ছাপ ক্লান্ত রোদ্দুরে
দিগন্ত প্রবাসী হ'য়ে গেছে।
যে গাছের সবুজ পাতা
আমি তুমি বা আমরা ছিঁড়লাম
শুনেছি তার শিকড় বেয়ে উঠে আসছে ঘূণ
ধবধবে জোছনাতুলো ফুলগুলো সব
কোন এক ডাইনি মন্ত্রে
একে একে হয়ে গেছে রক্তচুনী লাল।
চারিদিকে এত ভীড়, এত কোলাহল
তারই মাঝে
আমি তুমি বা আমরা এখন
থমকে আছি এক একটা দ্বীপ যেন নয়, নির্জন।

এসো এই বেলা
আমরা নিজেদের তর্পণ সারি।
হয়তো উত্তরসূরি থাকবে না কেউ।

সুবিমল বসাক

(১৯৩৯)

জন্মদিনে

জন্মদিনে ওড়ানো আটটি সাদা পায়রা, আজ
ফিরে আসে বত্রিশটি কালো শকুন—
চাতালহীন মাথার ওপর তাদের যূথবদ্ধ অবিশ্রান্ত ঘোরাঘুরি
জটিল ও বিশৃঙ্খল ছায়া
দুর্বোধ্য ও পারম্পর্যহীন চিৎকার
আমার সমস্ত মন দূষিত করে তোলে
জানা ছিল না, কি বিশাল রোমশ কালো হাত
ছড়ানো চারদিকে
বারবার হড়কে পড়ি কোন এক অদৃশ্যটানে—
বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে জমে ওঠে দুঃখ ও যন্ত্রণা—

আজ, আমার মায়ের ঝকঝকে কণ্ঠস্বরও
ধূসর হয়ে ওঠে।

—

গোপন কান্না

সমুদ্র দেখে আমি ছুটে গিয়ে ডুবিয়ে দিয়েছিলুম হাত
দেখতে চেয়েছিলুম আমার ভালোবাসার গভীরতা
এভাবেই আমি ছুঁয়ে দেখেছি শরীরের তাপ, শ্মশানের কাঠ

রমণপ্রিয় নারীর নোনা শরীরে মুখ রেখে আমি
পেয়েছিলুম এভাবেই সমুদ্রের স্বাদ।
সমুদ্র রমণী নয়—
পাড়ে দাঁড়িয়ে আমি একাকী
বিশালতার সামনে টের পাই কত ছোট আমি
কত তুচ্ছ মানুষের এ জীবন
তবুও, মানুষের শরীর ছাড়িয়ে বেড়ে ওঠে মাথা
ভেতরে খেলা করে কত শত লোভ ঈর্ষা কাম
কত শত অভিমান ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষা
মানুষের অপরাধের সীমা নেই
বিশালতার সামনে নীরবে মিশে যায় আমার
প্রতিবাদহীন মাথা
মানুষের কাছে মানুষই তুলে ধরে অপরাধ
এভাবে চেয়ে নেয়া যায় মানুষের ক্ষমা
রমণী জানে এসব
জানে সহানুভূতি, জানে শিকার, জানে প্রতিহিংসা
তাই সে ফিরিয়ে দেয় মানুষের কাছে মানুষেরই প্রকৃতি

সমুদ্র জানে না অতএব
তার নোনা জলে মিশে যায় আমার গোপন কান্না!

—

খেলা, খেলা হে ভারতবর্ষ

কারা থাকে ঐ বাড়িতে? বিশাল বাড়ি, কাঁটাতারে
ঘেরা মাইল মাইল পাঁচিল—কারা থাকে সেখানে?
আমি তাদের চিনিনা—চিনিনা হে ভারতবর্ষ—

কাচের শার্সির ভেতর ভেসে যায় লাল আলো—সার সার
মুণ্ডু দাবা খেলে—অদৃশ্য প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে
অবিরাম—দিন নেই রাত নেই—সময়-অসময় নেই—

কেবলি খেলে দাবা—শার্সির ওপারে রক্তাক্ত
দাবার ছক, ঘুঁটি, আমলা, নাগরিক, সংবিধান, আইন-শৃঙ্খলা
হাত ও আঙুলের নড়াচড়া—অদৃশ্য সুতোয় বাঁধা পুতুল নাচ—
মাঝে মাঝে শোনা যায় সশব্দ উল্লসিত চিৎকার—কিসতিমাৎ !

প্রচুর খানাপিনা হয় সেদিন—প্রচুর খানাপিনা—বাতাস
ছড়িয়ে দেয় ইতস্ততঃ মশলা ও মদ্যের সুগন্ধ—কুকুর ও
ভিখিরিদের ডেকে আনে সুখাদ্য ও সঞ্চয়—

আমি তাদের জানিনা, চিনিনা—মাঝে মাঝে দেখি
শার্সির ওপারে পাথরের মুখ, ঘন ভাঁজ, চেরা জিভ—
মধ্যরাতে কখনও বাতাসে বিলিয়ে দেয় ভয়ঙ্কর স্বপ্ন, ভবিষ্যৎ

বুঝি নাই এইসব , এতসব—কোনদিন আবিষ্কারও করিনি
কি কারণে রক্ত জমাট বাঁধে ধমনীতে—খেলা, খেলা হে ভারতবর্ষ

গোলামাঠে গলাকাটা তরুণকে পড়ে থাকতে দেখেছিলাম
কণিষ্ক-আবিষ্কারের নেশায় তাকে টেনে এনেছিল এইখানে
এই অনৈতিহাসিক খেলায়—

জীবনময় দত্ত

(১৯৩৯)

আমৃত্যু

জংধরা চাবি হাতে
বারে বারে অতীতের দরজা খুলে কি লাভ !
হয়ত বিপুল এক ঐশ্বর্য ছিল
আছে এক ধয়ক ইতিহাস
ভাড়াটে উর্দিতে সম্রাট সাজায় গরিমায়
কি বদলে যাবে বর্ত্তমান !

অবহেলিত কৃষ্ণচূড়ায় সমারোহে বসন্ত
বড় নিরক্ত মনে হয়। কিশোরী একসময় যুবতী হয়,
ভালোবাসা ? অতি ব্যবহারে অর্থহীন লাগে।
চারপাশে সারি সারি কপট মানুষ আমৃত্যু
এভাবেই বেঁচে থাকার প্রহসন করে যায়।

—

চৈত্রের শেষ বিকেলে

চৈত্রের শেষ বিকেলে
প্রবল হাওয়ায়
সব কেন কেমন এলোমেলো
হয়ে যায়

স্মৃতিরা সব
ভেসে যায় আকাশী বিস্তারে
হাট করে খোলা সব
জানালা কপাট
বুকের গভীরে শুধু
জন্ম নেয় এক গোপন দ্বীপ
দীর্ঘশ্বাসের, আবাল্যের স্মৃতি নিয়ে।

—

মা ফিরে এলে

ইদানীং সবই অনুপস্থিত
সমস্ত কোমলতা পেলবতা বা ভালোবাসা
স্নেহ, মমতা
অর্থাৎ মা। আমার মা আসলে
এখন নেই এখানে—বেড়াতে গেছে পশ্চিমে।
উদাসীন পলাতক বিকেলের মতোই
তাই একটা বিষণ্ণতা কাঁপে বুকের ভেতরে অনবরত।
আকাশে তাকিয়েও তো পাই না
বাতাসের কোন সুবাস
চারদিকে ছড়ানো শুধু অবাধ বিষ।
বড় অসহায় আর নিরালম্ব হয়ে পড়ছি ক্রমশঃ
দূরপাল্লার গাড়ি স্টেশান ছেড়ে যাবার পর
যে স্তব্ধতা চারপাশে ছড়িয়ে পড়ে
সে রকমই বুকের মাঝে টের পাই
এক অজানা তিরতিরে ব্যথা,
জোর পাই না লড়াইয়ের

অথচ সংগ্রাম ছাড়া কবে কে জিতেছে !
তাই প্রতীক্ষায় আছি
আবার গোড়া থেকে সব শুরু করার জন্যে
কবে কোন ভোরে
মা ফিরে এসে ।

—

মলয় রায়চৌধুরী

(১৯৩৯)

প্রস্তুতি

কে বললে বিধ্বস্ত হয়েছি? দাঁত-নখ নেই বলে? ওগুলো কি খুবই
জরুরি? আবাটা চাকুর মেধা তলপেট লক্ষ্য করে দিয়েছি সেসব
এরই মধ্যে ভুলে গেলেন কেন! পাঁঠার মুখের কাছে
পাতাসুদ্ধু কচি এলাচের গোছা, সেই যে সেইসব কাণ্ড—ঘৃণাশিল্প ক্রোধশিল্প
যুদ্ধশিল্প, পিছমোড়া মুখবাঁধা যুবতী সানথাল, গোলাপী ফুসফুস ছিঁড়ে
কুখরির ধারালো আনচান—সেইসব?
হৃৎমাংসে রক্তমেখে উঠে আসা চাকুর গরিমা? আমার তো গান বা
সঙ্গীত নেই, কেবল চিচকার, যতোটা হাঁ করতে পারি
নির্বাক জঙ্গলের ভেষজ সুগন্ধ, ঘুঁজিপরিসর কিংবা হারামসন্ন্যাস
বলিনি, জিভ দিন জিভ গোঙানি ফেরত নাও
দাঁতে দাঁত দিয়ে সহ্য করার ক্ষমতা, নির্ভীক বারুদ বলবে:
মূর্খতাই একমাত্র শিক্ষণীয়—উদারহস্ত হলো—

দাঁতে ছুরি নিয়ে আমি লাফিয়েছি জুয়ার টেবিলে, তোমরা ঘিরে ফ্যালো
ছেঁকে ধরো রাবার বাগিচা কফি চায়ের বাগান থেকে
গামবুটে স্বচ্ছন্দ চাকুরিসুদ্ধু এসো কে কোথায় আছো
জরাসন্ধের পুং যেভাবে বিভক্ত হয় হীরকের দ্যুতি ছলকে ওঠে
হাতপা চালিয়ে যাওয়া ছাড়া আর
জ্ঞানগম্যি বলে কিছু নেই
বাঁশির মতন করে সিঁধকাঠি বাজিয়ে দেখেছি আমি অসুখে-অভাবে
আপেল ত্বকের মোমরেণু-মাখা ভঙ্গুর স্নেহ
সঙ্গমের আগে যদি পিপীলিকা ডানা খুলে রেখে দেবে পাশে

আমিও উদ্ধত চাপড়ে বিকট চিৎকার দিচ্ছি : পৃথিবীকে খালি করো
বেরোও বের হও সর্বশক্তিমান
বান্দরের চুলকানিপ্রবণ চার হাতে শঙ্খ
চক্র পদ্ম গদা নিয়ে নিজের মায়ের স্তনে দংশন বিদ্রোহ হোক
বারুদ সুতলি ধরে বিস্ফোরণের দিকে ছুঁচাকার স্ফুলিঙ্গ ছুটুক
সারা গায়ে অন্ধকার লেপটে এসো বাক্কসনের কারবারী
কুকুরখুদার মনোমালিন্যে ভরা মাঝরাতে
কীটনাশকের ঝাঁঝে মজে থাকা কডিতের কম দুপুরে
ভূজ্ঞানসম্পন্ন কেঁচো উঠে আয়
চাকুর লাবণ্য আমি আরেকবার এ-তল্লাটে দেখাতে এসেছি।

বাড়িদখল

দরোজায় লাথি মেরে বেহায়া চিৎকার তুলছি মাঝরাত্তিরে
যারই বাড়ি হোক এটা খুলতে হবেই নাতো ভেঙে ঢুকে যাবো
সামলাও নিজস্ব স্ত্রীলোক বাঁদি সোনাদানা ইষ্টদেবতা
ফেরেবের কাগজপত্তর নথি আজ থেকে এবাসা আমার
ভোর হলে রাস্তায় সমস্ত আসবাব ছুঁড়ে ফেলে দোবো
শঙ্খের গ্রীষ্মবর্ষা পাপোশের নারিকেলসারি-ছায়া পোশাকের মেখলা নূপুর
গয়নার ভালোবাসা বাসনের দিনান্তের খিদে
সদর দরোজা দিয়ে ধাক্কা মেরে বের করে দোবো
দখল করছিনা আপাতত কেননা এখনো অনেক বাড়ি বাকি।

অস্তিত্ব

ভোররাতে দরোজায় গ্রেপ্তারের টোকা পড়ে
একটা কয়েদি মারা গেছে তার স্থান নিতে হবে

জামাটা গলিয়ে নেবো ?   দুমুঠো কি খেয়ে নেবো ?
পেছনের ছাদ দিয়ে পালাবো কি ?

কপাট ভাঙার শব্দে খসে পড়ে চুনবালি
মুখেতে রুমাল বেঁধে কিছু লোক ঘরে ঢুকে পড়ে

'ট্যারাচোখ ফরসা-চেহারা লোকটা কি যেন কী নাম
কোন্‌ঘরে লুকিয়ে রয়েছে নয়তো আপনাকেই
আমাদের সঙ্গে যেতে হবে'

ভয়েতে গলার স্বর বুজে আসে :   আজ্ঞে স্যার কালকে সকালে
পাড়ার লোকেরা তাকে কুপিয়ে মেরেছে।

—

আলো

আবলুশ অন্ধকারে তলপেটে লাথি খেয়ে ছিটকে পড়ি
পিছমোড়া করে বাঁধা হাতকড়া স্যাঁতসেতে ধুলোভরা মেঝে
আচমকা কড়া আলো জ্বলে উঠে চোখ ধাঁধায়
তক্ষুণি নিভে গেলে মুখে বুট জুতো পড়ে দুতিনবার
কষ বেয়ে রক্ত গড়াতে থাকে টের পাই

আবার তীব্র আলো মুহূর্তে জ্বলে উঠে নিভে যায়
গরম লোহার রড খালি পিঠে মাংস ছেঁচে তোলে
আমাকে লক্ষ্য করে চারিদিক থেকে আলো ঝলসে ওঠে ফের
আপনা থেকেই চোখ কুঁচকে যায় দেখতে পাইনা কাউকে
একসঙ্গে সব আলো আরেকবার নিভে গেলে
পরবর্তী আক্রমণ সহ্য করার জন্যে নিজেকে তৈরি করে নিই ।

—

জ্যোতির্ময় দাশ

(১৯৪০)

আন্তর্জাতিক

স্থবির পিরামিডের গায়ে এইমাত্র নাম লিখে আমাদের মাননীয় নেতা
ইতিহাস হবার বাসনায় স্থির শুয়ে পড়লেন পুরানো ম্যমির মত
অথচ রোমক সম্রাটের সঙ্গে কোন চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়নি কোনদিন—
বিনা সুদে নিয়মিত খাদ্যশস্য ফেলে অভিজাত অ্যালসেসিয়ান
বংশজাত বনেদী-শিশুরাও পায়ের তলায় বিগলিত নতজানু থাকে
তবু মুদ্রাস্ফীতি রোধ করা সম্ভব হয়নি কোথাও !

সমস্ত হিসেব কয়েক বছরে যে এতই জটিল হয়ে উঠবে
সে কথা বলা হয়নি কোন প্রতিবেদনে—
নিপাট ভালোমানুষী জামার আস্তিনে লুকোনো অস্ত্র
এবং বিস্তর প্রগল্‌ভ প্রশংসা পকেটে ভরে এখন
কুশল জিজ্ঞাসা করা চলে নিশ্চিন্তে শ্মশানে দাঁড়িয়ে।

গুরুতর কয়েকটি জাতীয় সমস্যার আশু সমাধানের নির্দেশ নিতে
আমি সেই নেতাকে নির্বাচনী এলাকায় খুঁজলাম অনেকক্ষণ
শেষে একটি ত্রিপাক্ষিক আলোচনা চক্রের আহ্বায়ক হিসেবে
সরাসরি গেলাম কয়েকটি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে—

অকস্মাৎ একদিন টুটেনখামেনের কবরের গুপ্ত দরজা খুলে দেখি
সেই শক্তিশালী নেতা নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছেন কফিনে শুয়ে—
পায়ে প্যারিসের মকাসু জুতো, আর আবিসিনিয়ার রানীর

প্রিয় বেবুনের উলঙ্গ ম্যামিটি ডানপাশে সযত্নে রাখা।

আমি সমস্যাগুলি বাঁ-ধারে রাখতেই তিনি পাশ ফিরে শুলেন

—

ঐকতানে কলরব

প্রথমেই বলে রাখা ভালো, শহরে পালিত আমি
নিয়ত প্রতিদিন নানাবিধ কোলাহলময়
এক সীমাহীন জলাশয়ে আকণ্ঠ নিমজ্জিত—
কাচের বয়ামে রাখা জলছবি মাছেদের মত
তবু মুক্তিহীন একই গণ্ডিতে বদ্ধ নিরবধি
চক্রাকারে ঘুরে ফিরে খেলা করি।

খুবই ইচ্ছে হয় মাঝে মাঝে নির্জন কোথাও যাই—
অবিচ্ছিন্ন এই শব্দময় নাগরিক বাতায়নে
উচ্ছল ধ্বনিতরঙ্গ করাঘাত করে ক্রমাগত,
একান্ত দুর্লভ আজ নিরিবিলি আকাশ এখানে।
ভালো লাগে কিছুকাল কোন ধ্বনিহীন পরিবেশে
কুমীরের মতো স্থির ভেসে থাকি, কেননা
সকলেই সময়ের এই দুরন্ত আসরে দু'একটি
শান্তির নীরব প্রহর ফিরে পেতে চায়।

শাল মহুয়ার পাতাঝরা স্বপ্নময় পথ
কপোত-কপোতীদের নিভৃত আলাপের দিন
ঝিঁ ঝিঁ ডাকা রূপকথার সেইসব ফেলে আসা রাত
পিতামহীর গল্পশোনা মুগ্ধমন কাঁথার আড়াল

শব্দভেদী বাণে সব ছিন্নভিন্ন রক্তাক্ত এখন।

কি এক অকারণ কোলাহলে মেতেছি সবাই
কোথাও আজ আর নিজস্ব নির্জনতা নেই।

—

স্বপ্ন নিয়ে

ভাই বন্ধু প্রিয় প্রতিবেশী আত্মীয় মিছিলে
ফলিত জ্যোতিষে যারা কিছুমাত্র ব্যুৎপত্তি রাখে
মাঝে মাঝে অপরিচিত সেইসব বিধাতার কাছে
প্রসারিত মেলে ধরি অক্ষম নিজের হাত।
ভাঙাচোরা অসরল তালুর ধূসর রেখায়
জেনে রাখি ফেলে আসা অতীতের ব্যক্তিগত কথা
যদিও পুরানো সে ইতিহাস জানা সকলেরই।

অতিদূর সৌর দেশে কোন্ গ্রহ পথভ্রষ্ট আজ
কার কোপানলে বর্তমানে কাদায় পড়েছি
আগামী বছর ঈপ্সিত কোন্ শুভলগ্ন হতে
সৌভাগ্যের জানালায় সূর্য দেখা দেবে
সুনিশ্চিত জেনে মন বড় তৃপ্ত হয়! অবশ্য
বিগত অতীত আর অনাগত ভবিষ্যতের কথকতা শুনে
দিন আসে দিন যায়, প্রতিশ্রুত প্রগতি আসেনি!

তবুও পথে ঘাটে জ্যোতিষী বন্ধুর দেখা পেলে
আজো মেলে ধরি প্রথামত মধ্যবিত্ত হাত
দেওয়ালে ঘড়ির দাগে তারপর স্বপ্ন গুণে রাখি!

—

অমল সেনগুপ্ত

(১৯৪০)

সারাবেলা

প্রতীক্ষায় থাকে সমগ্র চেতনা সূর্যমুখী :
বিস্মৃত মমতা ফোটে বোগেনভিলায়,
আরক্ত গোলাপে। কখন চকিতে
নির্জন বাগানে ফোটে মল্লিকার স্তব,
রক্তের সোনা ছলকে ওঠ বিনম্র চুড়িতে,
বাজুবন্ধে। চোখের আতস কাঁচে
গ্রাহ্য হয় বুকের স্পন্দন—গোপন অক্ষর :
সমস্ত চেতনা প্রতীক্ষায় থাকে।

জাগরণে যায় অতন্দ্র প্রহর হঠকারী দিন
গোপন তহবিল থেকে কখন সময় গেছে,
প্রকাশ্য দর্পণে স্পর্ধিত বলিরেখা
ঘুমের বিভ্রান্ত খাঁজে। রোজনামচায়
ক্রমশ স্ফুটস্ত ক্লান্তি।

অথচ পড়ন্ত বেলায় সুপুরির ছায়া কাঁপে
রোদ্দুরের সোনা কুচি কুচি ঝরে পড়ে সাজানো বাগানে—
আশ্চর্য গোলাপ ফোটে। বেলা যায় :
নেপথ্য ঘোষণা শেষে কী আশ্বাসে স্বপ্নের শরীরে
প্রাঙ্গণে নিবিড় ছায়া বকুলতলায় এখনো রোমাঞ্চ জাগে।
রক্তের সোনা দোলে হাতের চুড়িতে॥

—

প্রতীক্ষা কবিতার

আমার এখন দিন জুড়ে কেবলই প্রতীক্ষা
মল্লিকার বুকে কখন তরঙ্গ তোলে
নির্জন হাওয়া। বৃষ্টির চিকন ছোঁয়া।
রজনীগন্ধা আকাশে তোলে উন্মুখ বাহু,
বিগত বেদনা রক্তিম হয় প্রগাঢ় গোলাপে
আমি প্রতীক্ষায় থাকি।

বস্তুত এখন কেবলই প্রতীক্ষা,
নিরুত্তাপে বয়স বেড়ে যায়,
স্বপ্নে দেখা দগুকলসের ফুল মাথা নাড়ে।
শূন্য রাজ্যপাট—রত্নহার কিরীট মুকুট পিছে ফেলে
ফেরারী কাঙ্ক্ষিত ঈশ্বর : আমার কবিতা।

এখন প্রতীক্ষা কেবল কবিতার।
বুকের গোপনে টুংটাং জমা হয় পলাতক শব্দ
বেলাশেষের সোনা রোদ অনায়াস ঝরে পড়ে।
রাত হোক, যদি আলো ওঠে—বঁড়শির মতো বাঁকা চাঁদ
ঝুলে থাকে রাতের ওপারে।
কখন বেরিয়ে আসে

শব্দের শৃঙ্খল ভেঙে প্রসন্ন কবিতা :

আমি প্রতীক্ষায় থাকি॥

—

বিবাহ বার্ষিকী

আলগা মুঠি থেকে এক একটি দিন খসে পড়ে
হাওয়ায় ভাসিয়ে দিয়ে বসন্ত মালতী
চন্দন সাবানের স্নিগ্ধ সুরভি,

ক্রমশ ঝরতে থাকে শব্দের সঞ্চিত পুঁজি
যুদ্ধের গহ্বরে স্রোতোধারা ক্ষীয়মাণ।

অথচ গোপন বাক্সে উজ্জ্বল চেয়ে দ্যাখো
অভিমান পরাজয় প্রশান্ত বেদনা,
চন্দন ছোপানো মুখে সলজ্জ টোপর,
রুদ্ধ নিঃশ্বাসে নাকের নোলক দোলে
যদিদং হৃদয়ং মম, অপাঙ্গ চাহনির ভালোবাসা
সুখে দুঃখে দীর্ঘপথ দিবস রজনী
গৃহস্থালী বেবিফুড বর্ণপরিচয়
আত্মজের করপুটে পূর্ণতায় গাঢ়।
ক্রমশঃ নিবিড় দ্যাখো
আমূল প্রোথিত ভালোবাসায়।
আনমনে দুই হাত ভরে যায় অলক্ষ্য ফসলে॥

—

দাশরথি সেনগুপ্ত

(১৯৪১)

নিয়ন-আলোয় তোমাকে

মুখের এক পাশে আলো,
অন্য পাশ আবৃত ছায়ায়—
সঘন চুলের রাশ
কিছু উদ্ভাসিত, কিছু কালো অন্ধকার।
জন্ম আর মরণের রহস্যে রহস্যময়ী তুমি
কাছের, দূরের—
চেনা চেনা, তবুও অচেনা।
অত্যন্ত সহজে তুমি কাছে আসো,
আমাকে জড়াও
মায়ের হাতের বোনা শৈশবের কাঁথার মতন,
পরক্ষণে মনে হয়
শরীরের সমস্ত শোণিত
অকাতরে বিলিয়ে দিলেও
তোমার দক্ষিণ হস্ত প্রতিদানে উন্মুক্ত হবেনা।
বিলোল আর্দ্র চোখে নিয়তির নির্মম নির্দেশ।
উপেক্ষার সাধ্য নেই, তাই
ভালোবাসা নামে এক অরণ্যের আলো-অন্ধকারে
কম্প্রগাত্র হৃদয়ের মৃগ।

—

সবুজ বিপ্লব

সবুজ বিপ্লব আসে বাংলার বুভুক্ষু প্রান্তরে—।

কাঁকুরে, দোআঁশ, বেলে, এঁটেল মাটির
মর্মস্থল ফালা ফালা করে
ট্রাক্টরের যান্ত্রিক নখর—।
পাম্পের দাম্ভিক গমকে
গভীর জলের গন্ধে মিশে যায়
সুফলা সুবাস।
কাঁচা বাড়ি পাকা হয়;
পেট্রোলের ধোঁয়া ছেড়ে উড়ে যায়
তদারকী মোটর সাইকেল—
হাতে সিগারেট, পায়ে কোলাপুরী
ঘর্মাক্ত মালিক
সচ্ছল জামাই আর স্বর্ণময়ী পুত্রবধূ খোঁজে।
আর খোঁজে
কোটি কোটি হাড্ডিসার হাত
'কাজের বদলে খাদ্য'
আর জ্বলে সবুজের গাঢ় অন্ধকারে
কোটি কোটি বিবর্ণ চক্ষুর
ক্ষুধিত খদ্যোত!

—

অথবা শৈশব

টালমাটাল পায়ে পায়ে
জন্মভূমি মেপে নিত
সেই শিশু!

কাকচক্ষু জল জুড়ে অম্লান আকাশ
পায়রার পাখায় ঝলমল,
সারাদিন ছড়াছড়ি বিস্ময়ের;
মায়ের আশ্চর্য মুখে
ভবিষ্যৎ জ্বলে!

কোন্ ভবিষ্যৎ?
দুঃখের সবুজ পানা চক্ষের অসতর্ক কোণে—
ক্রমশঃ আকাশ নেই,
পাখিরা উধাও;
মায়ের বিষণ্ণ মুখ আগুনের হলুদ হল্কায়
গনগনে বর্তমান!

এই বর্তমান
মুছে যাওয়া রৌদ্রের আশায়
কেবল বিবর খোঁজে!

অথচ চৌকাঠ
পেরোলেই জন্মভূমি,
ফুটপাথে ফুটন্ত শৈশব॥

বারীন ঘোষাল

(১৯৪৪)

যাদুঘরে

গিলোটিনে মাথা রেখে মনে হচ্ছে রাজা

ধীর এক আগ্রহে সম্পন্ন

যাদুঘরে

সংসারে

রাজা হয়ে উঠলুম এক আশ্চর্য নগরীতে

শেষ হয়ে যাবো

চেনা ও বিকাশশীল ভোর দেখতে দেখতে

শেষ হয়ে যাবো

খবরের কাগজে মোড়া জনহীন আশ্চর্য নগরী

ইটকাঠের বস্তমাফিক আশ্চয অমলিন নগরী

আমাকে রাজা হয়ে উঠতে দিল

শেষ হয়ে যাবার জন্য দিল এই প্রতিমা

—

শ্মশান যাত্রা

সবচেয়ে ভালো লাগল পথের বেঁকে যাওয়া

ভোরবেলা ঘুরে এসে বসল বাতাসদামে

হাসপাতালের বারান্দায় উড়ে এলো শেষ ধুলো

দেখো যেটুকু দেখা যায় কৃষ্ণচূড়ার পাশে গাছকে

যেটুকু দেখতে ভোর আর একবার এলো পুরীর দরজায়

সংসারের ধারে কে একটা খাঁচা রেখে গেছে
রেখে গেছে বাকি পাঁচফুট উঁচু স্বপ্ন
যা এখনি হেলেদুলে রওনা দেবে
বা প'ড়ে থাকবে এমনি বিকেলবেলা
ভুল ক'রে ময়দানে গিয়ে বসবে জয়ন্তী
সত্যিকথার ভয়ে একজন দূরে দাঁড়িয়ে হাসছে
আর একটু একটু করে বেঁকে যাচ্ছে পথ

—

তোমাকে ছাড়ছি না

যেমন ক'রে বাঁচো এবং বাঁচাও আমাকে
আঁধার ভাঙো
টুকরো করো আলোর মহিমা
যত শেখাও তুমি অম্লজানা
যতই শেখাও ব্যর্থ ক্লোরোফিল
বেঁচে থাকার রহস্যে আর তোমাকে ছাড়ছি না
শিকড় হয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরেছি
যেমন ক'রে দাঁড়াও নির্জনে

ঘর উপত্যকায় ফাটল মাটির চৈত্রটানে
দুটি স্তনের মাঝে তোমার শরীর-গন্ধ লুকাও
জন্ম দাও যেমন আবার জন্ম কেড়ে নাও
পরাগে বিষ মিশিয়ে তুমি ক্ষান্ত করো কাকে
আমি তোমাকে ছাড়ছি না
ছাড়ছি না ॥

—

পূর্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়

(১৯৪৪)

ফ্রীজ শট

ট্র্যাফিক সিগন্যালের
সব ক'টি নিষেধাজ্ঞা ভেঙে
চলে গেলে সুদূর স্টেশনে।
সঙ্গে করে নিয়ে গেলে বুকের প্যারাম্বুলেটরে
চঞ্চল শিশুর হাসি, জীবনবীমার স্বপ্ন,
কবিতার উষ্ণ পাণ্ডুলিপি।

তুমি চলে গেলে—
সাজানো ড্রইংরুমে বিস্ফোরণ, জানলার পর্দা ছিঁড়ে—
উড়ে যায় গার্হস্থ্য পাপোশ,
রঙ্গমঞ্চে অন্ধকার নেমে আসে, তীব্র গ্লেসিয়ার—
নিমেষে ভাসিয়ে দেয় হৃদয় নামক সেই শীর্ণ মোমবাতি ;
ঘনিষ্ঠ উঠোন জুড়ে ছায়া নামে—ছায়া, দীর্ঘতর হয়,
শোকার্ত নদীর ধারে পড়ে থাকে শস্যহীন হেমন্তের ক্ষেত

সন্ধ্যে হলে ফিরে আসা পাখিদের শ্রান্ত কোলাহল
তোমার ঠোঁটের ঠিক নীচে,
কত সাবলীল ফ্রীজ হতে দেখে—
দেরাজে রেখেছি ছবি, কার্বাইড জ্বলে গেছে—তবু।

—

পিপাসার্ত চোখে

কে যে কেন ফেলে যায়, রঙিন রুমালগুলি
সন্তর্পণে সুদূর সোপানে ;
সোপান কী কারো উষ্ণ ব্যক্তিগত বুকের সেতার
যেখানে রাখলে স্পর্শ অকস্মাৎ মায়াবী আঙুলে
শৈশবের পরিত্যক্ত স্বরলিপি
বাজে নাকি একান্ত গোপনে ?

সময়ের স্রোতে হায় ভেসে ভেসে চলে গেছ
মৃত্তিকার কেন্দ্র থেকে—দূরে,
আমি যেন পদচিহ্ন দেখে দেখে
চলে গেছি বিষণ্ণ স্টেশনে ,
যেখানে অশ্রুর দাগ ক্রমাগত গ্রাস করে
রুমালের স্বপ্ন কারুকাজ।

এখানে সবুজ নেই, প্রাত্যহিক দূরবীণে চোখ রেখে দেখি,
কোথাও সমুদ্র নেই—হৃদয় উদ্বেল করা
গর্জনের হাতছানি নেই,
শোকার্ত পায়ের শব্দে ভীত হয়ে, ত্রস্ত হয়ে
পলাতক প্রতিবেশী হাত।

বিষণ্ণ বিকেলে তবু জেগে থাকে—
কী নিবিড় প্রতীক্ষায়—সারি সারি পিপাসার্ত চোখ।

—

যখন সময়

এখনই কী আসতে হয়। এখনই,
যখন সময়,
হিংস্র নাবিকের মতো ধরে আছে—
ধারালো হারপুন, দূরবীণে রেখেছে চোখ—
সাগর তিমি-র নিশ্চিন্ত শরীরখানি ভেসে ওঠে
কখন কোথায়।

এখনই কী আসতে হয়। এখনই,
যখন, চারিদিকে বেজে চলেছে পাগলাঘন্টি,
যে-কোন রাস্তার মোড়ে তর্জনী তুলে লালবাতি,
নৈঃশব্দ্য ঘনিয়ে আসে, অশ্রুপ'তে বিনষ্ট সময়—
কারফিউ লাঞ্ছিত এই হিম আস্তাবলে
কত যে আলোকবর্ষ, কেটে যাবে রাত।
পারমাণবিক ঝড়ে ভেঙে যায় ইউ. এন. ও-র সম্ভ্রান্ত মিনার।
তবুও রুপোলী দেখে ছুটে যাও আলোর দিকে,
কেমন নিশ্চিন্ত মনে গুণ গুণ গান গাও—
বাথরুমে পেছলে দাঁড়িয়ে,
করতল প্রসারিত, দাবী করো প্রতিশ্রুতি কবোষ্ণ চিবুকে।

বুকের নিভৃত খাঁজে কেন রাখো মায়াবী রুমাল।

—

দীপক গোস্বামী

(১৯৪৫)

গোপন সুখ

বৃষ্টি হলেই আমার ভাঙা তোরঙ্গ সিঁদুর চুপড়ি,
মা'র তীরকাটা চুড়ির নকশা টুপটাপ
জলের মতন স্মৃতির দোচালা থেকে
হৃদয়ের নিকোনো উঠোনে ঝরে পড়ে।
ঝড় এলে থৈ থৈ কুয়োতলা, অনুভূতি দাওয়ায়
হাওয়ারা ঝাঁপ খায়, দামাল ছেলের মতো তোলপাড়
শরীর শরীর, ঘাস বন, ঘুম ঘুম
শুষনী প্রহর, সবুজ ফড়িং ডানা তিরতিরে,
নাচন কোঁদন ভেসে যায়, বিপদ সীমায় কেউ নেই,
আলভাঙা জলের ছোঁয়ায় নুয়ে পড়ে পাকা ধান,
বুকের ফসল, চারিদিকে মহাজনী হাসি আর
গাঙ বেয়ে সচেতন ত্রাতা ডাক দেয়, যার মাঝে

বৃষ্টি হলেই আমার অনেক গোপন
সুখ মনে পড়ে যায়।

—

৫

সংরক্ষণ

সবকিছু যথাযথ রেখে দিও চালের বাতায়
গুঁজে রুপোর তিনটি টাকা, কাকতাড়ুয়ার গায়ে
উলিঢুলি ছিটের ফতুয়া, পুকুরে কচুরিপানা
আকাশ প্রদীপ—ঠিকঠাক কার্তিকের হিমঝরা
হাওয়ায় শুকোতে দিও ফেলে আসা দিন,
যৌবনের জামরুল গাছে অনুগত ঋণ
থাকা ভালো—বয়সের গোপন পাহারা।
আমি জানি, শেষরাতে কালপুরুষের
মতো অমোঘ স্তিমিত পায়ে ফেরা যায়
নরম মাটিতে, তিন প্রহরের নীচে চাঁদ, বাস্তুসাপ
কুকুর কুণ্ডলী পাশে রেখে দরোজায়
টোকা দিলে কেঁপে যাবে হুতুমের ডাক, বুকের ভেতর
থেকে রাবণের চিৎকার আওয়াজ, ফুলে ফেঁপে উড়ে যাবে
খোড়ো চাল, নরম দেওয়াল—শুধু সেই
ভাঙনের ছাপটুকু নিয়ে সবকিছু
যথাযথ রেখে দিও, তুমি চিরকাল।

—

নিত্যশবরী

কোন একটা ঘাটে আমার জন্য নৌকো বাঁধা আছে,
বন্দরে জাহাজ কিংবা স্টেশনে ট্রেন,
অথচ আমি বহুদিন কোথাও যেতে চাইছি
কিন্তু দরোজাটা পেরোতে পারছি না
হয়ত দরোজাটা মানেই কিছু শেকড়বাকড়, মাটির অনেক নীচে

জটপাকানো শিরা ও ধমনী, কিংবা দুপুর জুড়ে
মাঝ উঠোনে পিসীমার শীতের আচার।

যাইহোক, চৌকাট পেরোলেই অনেক চওড়া সড়ক।
ডকূলভাসানো দূর অনেক নাব্য নদী, রেলপথ,
সমতল থেকে শুরু করে
গোপন জটিল লুপ পারাপার করে। বাধাহীন
সেই পথ দিয়ে আগুপিছু পথিকের দল
নরম রোদের ওমে ভেসে চলে গেছে,
কেবল হাঁটনটুকু জমে আছে
অশ্বত্থতলায়, জলসত্র আর তিনমাথা মুদীর দোকানে।

কেউ কি এমন করে যেতে পারে যে যাওয়ায়
দাওয়ার খুঁটিতে কোন প্রতিশ্রুতি থাকে,
কোন আকর্ষণ বেড়ে ওঠা পুঁই-এর মাচায়,
কিংবা গোয়ালের কইলে বাছুরে? তবুও
অশ্বত্থতলীর বাঁক, জলসত্র, মুদীর দোকান
ঝিঁঝিঁর ডাকের মতো একটানা ডেকে চলে।
মাঝরাতে ঘুম ভেঙে দেখি স্থলপথ জলপথ
একাকার হয়ে কুয়াশায় বাতাসিয়া লুপ।
হঠাৎ তক্ষক ডাকে এক দুই তিন চার
পেটা ঘণ্টা ইমামবারায়।

অথচ হাঁফ ছাড়বার জন্য লাঠি ও পুঁটলি নিয়ে
পা বাড়ালেই
দু-চোখের চৌকাট পেরোতে পারিনা।

—

কালী মোহান্ত

(১৯৪৬)

পদ্মাগঙ্গাধারা সমান্তরাল

এখনি বন্ধ করলে সব পত্রালাপ ?   দেখাসাক্ষাৎ কতোদিন নেই
খুলনা-বাগেরহাট চলচ্চিত্র তবু
লঞ্চের যাতায়াত, লোক কোলাহল
তারও কয়েক মাইল উত্তরে গেলে
তোমায় কি আজো দেখা যায় কবি বা জারিগানে একা তন্ময় ?

পত্রালাপ না হয় থাক্ স্মৃতি তো দীপ্ত তবু, আজও অক্ষয়···

আমরা সবাই বয়ে গেছি
ভেসে গেছে স্বপ্ন-সাধ-আহ্লাদ,
বিপদে বন্ধু চেনা যায়,—তাও তো চিনেছিলাম অসুখ-সময়ে !

ছিন্নভিন্ন সব যোগাযোগ, এখনই বন্ধ করলে বাকি পত্রালাপ
আমার রক্তে তবু নিত্যবহমান পদ্মাগঙ্গাধারা সমান্তরাল।

—

বিশ্বাস হারিয়ে যায়

বিশ্বাস হারিয়ে যায়
ধুয়ে যায় আস্থা-ভালোবাসা
অপরাধ আমার নয়

কণ্ডূক মুনির পাপ
ছোঁয় যদি তার পবিত্রতা

এ কারুর দোষ নয়
ভাগ্য নয়, কৃতকর্ম দায়ী
খাল কেটে কুমীর আনলে
পড়শির দায় নেই, দায়ী গৃহস্বামী

কোনোখানে আসলের দাম নেই।
মূল্যহীন নিষ্ঠা-সততা
গরুগাধা—একই দাম
মানুষের চেহারায় শূন্য মানবতা

বিশ্বাস হারিয়ে যায়
জেগে ওঠে বিদ্বেষের ফণা।
আজ যদি পুরুলিয়া জ্বলে,
কালকে বন্যায় ভাসে আরা, চন্দ্রকোণা॥

—

দিয়ে যাবো

যাবার আগে শিশুকে দিয়ে যাবো
ঋজুপথ সরলরেখা, যাবতীয় বর্ণপরিচয়
সুমধুর ছলনাতে আগামীদিনের যীশু
যেন-না ক্রুশবিদ্ধ হয়

বলে যাবো মন্ত্রগুপ্তি, জ্যোৎস্নার ফাঁদ

বিশল্যকরণী হাতে দিয়ে,
দেখাবো সাপের গর্ত, লাস্তবিভ্রম
বিপর্যয়ের চাকাসহ পতন এবং ধ্বংস্ ;
অধঃপাতের সব সিঁড়ি গুণে দিয়ে দিয়ে,
বলবো—খোকন, সুস্থ সবল দাঁড়াও
সোজা হয়ে

শিশুদের দিয়ে যাবো
সুমিষ্ট ফলের নাম, পুষ্প-পরিচয়

সাথে দেবো পাদটীকা—
অসফল, ব্যর্থকাম ভগ্নহৃদয় ॥

—

জয়ন্ত ঘোষ মৌলিক

(১৯৪৬)

ঈশ্বরের ঘণ্টা

খরতাপের জরায়ুর মধ্যে
বেড়ে ওঠে কালবৈশাখী ভ্রূণ
গভীর দুঃখের দরজায় ঈশ্বরের ঘণ্টা
বেজে যায়। আমি আমার ভাণ্ডাঘর
সারিয়ে তুলি, ছেলেপুলের জন্যে
আহার্যের সন্ধানে রত হই। পদে বিদ্ধ
কোন কুশাঙ্কুরের দিকে মনঃসংযোগের সময়
নেই। এখন আমার সামনে সমুদ্রের নীল ফেনা
গভীর ঘুমের মতো পেলব হাত বুলিয়ে দেয়।
বৃদ্ধের অবলম্বন লাঠি ও চশমা তবু
আমি ঘুমের মধ্যে পাশ ফিরি না।

—

প্রশ্ন

তোমার হাতে ভর করে অনেক পথ
হাঁটলুম। অনেক পথ।
ঢেউয়ের মাথায় মণিমুকুট যুবক হতে
সাধ হল। এখন কি

তুমি তোমার হাত ফিরিয়ে নেবে ?

তুমি আমায় অনেক দেখালে। অনেক।
অন্ধকারে যে ঘাসফুল জ্বলে তাকে
সূর্যের অভিষেকে প্রথম চিনলুম।
ঈশ্বর তুমি কি এখন
তোমার হাত ফিরিয়ে নেবে ?

স্বপ্ন

কেবল একটাই দুঃখ ছিল আমার
বাক্স বিছানা গুছিয়ে রেখেছিলুম
কিন্তু আমার নাম ধরে একবারও
ডাকলে না—এক প্লেট খাবার
এক কাপ চা আর কয়েকটি মামুলি কথায়
দীর্ঘ অপেক্ষা জল হয়ে যায়।

পথে নামতেই কি বৃষ্টি কি বৃষ্টি
ধুতি পাঞ্জাবী ভিজে লাট চুলে
বিপর্যয় মনে শোক কিন্তু
ঝড়ো হাওয়ায় আচম্বিতে রক্তকরবীর
দুটো ভিজে পাপড়ি আমার
বুকের মধ্যে হাত রাখে।

—

বিশ্বজিৎ সেন

(১৯৪৭)

হয়নি

দুঃখকে নিয়ে আর যাই হোক
সংসার করা চলে না
সে আমাদের বড় বেশী উদ্বেলিত করে।

থেকে থেকে
মনে পড়তে থাকে
সেই স্টেশনের টিনের চালে
কথা বলার মতো ঝরছে যে
অচেনা ফলেরা রাত্রিদিন ;
চোখে ভাসতে থাকে
একটি ছেড়ে যাওয়া ট্রেন
ভেসে যাওয়া নদী
গলায় কণ্ঠীপরা ভোরসকালে
খঞ্জনীর তালেবোলে
আকাশ আর পৃথিবীর
ভালোবাসাবাসি-র গল্প বলত যে
বোষ্টমটি।

কোথা থেকে সহসা
হাতের মুঠোয় এসে যায়
কএটি নীল চিঠি

লেখা হয়েছিল
তাকে দেওয়া হয়নি···

—

মানুষটি

যার জন্য এই সামূহিক অট্টরোল
সেই মানুষটি কোথায় ?
একে অন্যের গায়ে ঢলে পড়েছে
ব্রীফকেস এবং
শান্তিনিকেতনী ঝোলা
কানে কানে কথা বলছে এ ওর
গান্ধীটুপী ও নেপালী রানাক্যাপ
গেরিলাটুপী ও গল্‌ফক্যাপ
বাঁধানো ও তরতাজা দাঁত
থলথল বয়ে যাচ্ছে দাক্ষিণ্যের ভাগীরথী—
মানুষটি কোথায় ?

কোন্ নির্জন স্টেশনে ট্রেনের প্রতীক্ষায় ?
কোন্ খড়িওঠা মাঠে শস্যের জন্য দাঁড়িয়ে ?
কোন্ ঘা-দগদগে এন. এইচ্.-এ বাসের অপেক্ষায় ?

তার উদ্দেশ্যে নিবেদিত প্রতিটি প্রস্তাব
ফাটাফাটি সাবকমিটি-তে
এ লাইন চলবে না
ওই লাইন জুড়ে দাও
এবং হেলে ও বেঁকে

যথার্থ ভারসাম্যতা
এতসব কিচিরমিচির—
মানুষটি

কোন্ নির্জন স্টেশনে ট্রেনের প্রতীক্ষায় ?

—

ডাকবাক্সে চিরকুট

[মিথিলেশ মৈত্র-র স্মৃতিতে]

ভেবেছিলাম দেখা হবে
দেখা হয়নি
তোমার দরজা বন্ধ ছিল
রজনীগন্ধা স্তব্ধ ছিল
কালপুরুষের পাশে—
স্বতই উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল
আমার অর্জুন অভিমান।

পরে ভেবে দেখলাম
অভিমান করে লাভ নেই
আমরা প্রত্যেকেই
এক না একটি দিন
দরজা বন্ধ রেখে চলে যাব
ডাকবাক্সে চিরকুট গাঁথা থাকবে
"আমি গেছি পাশে
আসছি এখনি
একটু বসুন"

কেউই আর ফিরে আসব না।

সারাদিন রৌদ্র খেলবে লুকোচুরি
কাঠবিড়ালীর সাথে
পাতা ঝরে ভরে যাবে
পড়োশী উঠোন
গালে হাত রেখে দিন
বিকেলের দিকে চেয়ে
ভেবে চলবে
শৈশবের কথা।

সেও যেন কবে
ডাকবাক্সে চিরকূট গেঁথে রেখে
চলে এসেছিল ॥

—

শান্তিরঞ্জন চক্রবর্তী

(১৯৪৮)

সংলাপ মৃত্যুর সাথে

না, আমি গৃধ্নু নই তত—
মৃত্যু, তুমি যতই বলনা কেন
দিতে পার—শান্তির সংবাদ।

আমার পৃথিবী দেয়
মানুষের দীপ্ত ভালোবাসা,
আমার আকাশ দেঁয়
ক্লান্ত দিনে সুনীল আশ্রয়,
আমার জীবন দেয়
তোমাকে উপেক্ষা করে
বাঁচার প্রত্যাশা।

মৃত্যু, তুমি নতজানু হও
আমার ইচ্ছার কাছে।
এখনো অনেক দেনা
পৃথিবীর কাছে—ফেলে রেখে
চলে যাব তোমার আশ্রয়ে!
আমি তত স্বার্থপর নই।

—

বিদ্যুৎ পাল

(১৯৫২)

আজকের দিনটার জন্য

আজকের দিনটার জন্য একটা দিন
ইতিহাসের পাতায় আমি খুঁজছি,
আজকের তারিখটার জন্য একটা তারিখ।
সামান্য হলেও ক্ষতি নেই,
হয়তো লেনিন
একটা ছোট্টো জরুরী চিরকুট
আজকের তারিখে লিখে
শিক্ষার জনকমিসারিয়েটকে পাঠিয়েছিলেন ·

আজকের দিনটা নীল, উজ্জ্বল—
অসংখ্য কাজে ব্যস্ত হবে প্রত্যেকটা প্রহর।
আমি সেই প্রহরগুলোর জন্য একটা নাম
চাইছি, যেমন কবিতা একটা নাম চায়

আজকের দিনটা ফ্যাকাশে, বিবর্ণ—
অসহায়তায় ফেটে প্রত্যেকটা প্রহরের কার্বলিক
আশার কণ্ঠনালী কালো করে দেবে···।
আমি সেই প্রহরগুলোর জন্য একটা নাম চাইছি
যেমন বিদেশ বিভূঁইয়ে সন্ধ্যায় একটা ছিন্নমূল পরিবার
একটা দেশ চায়·

আজকের দিনটা যেমন তেমন—

কিছু কাজ কিছু অকাজ কিছু অর্থহীনতায়
অদৃশ্য হবে প্রহরগুলো।
আমি এই প্রহরগুলোর জন্য একটা নাম চাইছি যেমন
সংশয়গ্রস্ত মন
প্রেমকে দু'হাতের আলিঙ্গনে বন্দী করে রাখতে চায় চিরকাল

আজকের দিনটার জন্য একটা দিন
ইতিহাসের পাতায় আমি খুঁজছি
আজকের তারিখটার জন্য একটা তারিখ

—

আজ এই রাতে, দিদির স্মৃতিতে

কে তুমি অন্ধকারে একা জানালার সামনে দাঁড়িয়ে?

শেষবারের মতো দেখে নিচ্ছো রাতের আকাশ,
ঘরে ঘুমন্ত শিশুর নিঃশ্বাসের শব্দ শুনছো শেষবার,
শেষবার দেখছো বাইরের নিঃশব্দ পৃথিবীর ওপর
মানুষের দুনিয়াটাকে
যা তোমায় বাঁচতে দিলোনা…!

হাত থেকে নামাও কেরোসিন অথবা বিষের বোতল।
কড়িকাঠ থেকে শাড়িটা খুলে পরে নাও।
যাও।
নদীতে ডুব দিওনা, পার করো।
পারো তো মাঝির কাছে জীবনের হদিশ জেনে নিও;
বড়ো প্রাচীন আর উজ্জ্বল এই কথাটা
আমি আবার বলছি।

ডিস্ট্যান্ট সিগন্যালের কাছে দাঁড়িওনা, স্টেশনে যাও।
ট্রেনে ধানকাটনি পরিবারের মেয়েদের দেখা পাবে—
ওরা দেশান্তরী পাখীদের মতো—
পারলে ওই দেশান্তরী পাখীদের সাথে আলোচনা করো ;
বড়ো গতিশীল, ঝড়ের মতো এই কথাটা
আমি আবার বলছি।

যেখানে ইচ্ছা চলে যাও।
পাথর ভাঙো, জল খাটো, নষ্ট হয়ে যাও।
যা ইচ্ছা করো।
অনেক বড়ো এই পৃথিবী ,
যতদিন জীবন
কোনো কথাই শেষ কথা নয়,
কোনো পরিচয় শেষ পরিচয় নয়,
কোনো মৃত্যু অনতিক্রম্য নয়।

রাতের এই সময়
তোমার শেষ নয়
এক ভিন্ন তোমার শুরু।

—

নির্ঝর চট্টোপাধ্যায়

(১৯৫৩)

প্রতীক্ষিতার প্রতি

যদি আজও ফুলশয্যার পাশে স্ব-ইচ্ছায় নির্বাসন চাও
আমি বলি, এ নির্বাসন একক-বন্দিত্ব তোমার।
বলো, কি দিয়ে তোমায় বরণ ক'রে নেবো ?
কোথায় সেই জিয়নকাঠি যা শুধু একবার ছুঁইয়ে দিলেই
গ্রীষ্মে গৈরিক হই, বর্ষায় সবুজময়—
          পলাশের রক্তলাল আনন্দের জোয়ার আনে ?
এসো, হৃৎপিণ্ডে কান পাতো আমার—
          হাজার পদধ্বনি শুনতে পাবে তুমি,
চোখ তোলো, নির্নিমেষ চেয়ে থাকো চোখের 'পরে—
অনেক কুমারী-কঙ্কাল পাশাপাশি কবরিত সেখানে,
          মুক্তির আকৃতি নিয়ে বেঁচে আছে তারা।
চেয়ে দেখো, দুহাত রক্তাক্ত আজো বিপন্ন-বন্যতায়—
ঠোঁট ছুঁইয়ে রক্ত ঝরে বুকের গভীরে,
বলো, কোন্ সাহসে আজ প্রণয়-চুম্বন ফিরিয়ে দেবো তোমায় ?

অথচ আমিও, তোমার ঐ ফুলশয্যার পাশে
          স্ব-ইচ্ছায় নির্বাসন চেয়েছিলাম।

—

৬

ভ্রমণ

বাহার তীর্থতুল্য তোমার ঐ শরীরে
আমি এবার ভ্রমণ ক'রে পুণ্যবান হবো।
যদি কোনো পাপবোধ ভ্রমণে সঙ্গী হয়—
তুমি তাকে পরিশুদ্ধ ক'রো অন্তরের পবিত্রতায়,
যদি কোনো ক্ষত থাকে আমার এই সবিত্ত-শরীরে
তুমি তাকে নিঃক্ষত ক'রো ভালোবাসার ঐশ্বর্যে,
যদি আমি ভারসাম্যে টালমাটাল হই কখনো
তুমি তবে সাম্যে এনো নারীত্বের নিজস্ব গরিমায়,
এবং ঠিক যেমনটি চাও
তেমনভাবেই তিলে তিলে গ'ড়ে নিও আমায়
আমি এবার পুণ্যবান হ'তে চাই, ভ্রমণে—
তোমার ঐ তীর্থ-শরীরে।

বয়স বাড়ছে অতঃপর

বয়স বাড়ছে অতঃপর এখন যাকিছু করি উচিত অনুচিত সবকিছুই
উটের গ্রীবার মতো সমাহিত—নীরবে
নামৃতার মতো অভ্যস্ত ও নিয়মমাফিক।

এখন যাকিছু ঘটে সতর্কে পড়ে নিই ওজনে কমবেশি কোথায়?
কার পণ্যে কতটুকু খাদ আছে
কার হাতে কিভাবে বিদ্ধ হবো
নির্ভুল বলে দিতে পারি সহজেই।
ভক্তিতে ভুলিনা আর, অশ্রুতেও

বিকল্প নিয়ম ঘটে যায় নিয়ত ;
কুশল-বিনিময়ে আস্থিক হওয়ার মতো পালিত অসুখেও ভুগিনা আর—
আশায় ভর ক'রে কুঁড়েমির ঘাস ছেঁড়াও এখন আর পোষায় না,
কেউ কি অপেক্ষায় থাকে অহরহ, কে সে ?
বস্তুতঃ, অপেক্ষায় থাকা না থাকা এবম্বিধ শব্দগুলি
সমার্থক মনে হয় ইদানীং,
টুপ ক'রে পেরিয়ে এলে শূন্যস্থান অন্য কেউ পূর্ণ করে তক্ষুনি।

বয়স বাড়ছে অতঃপর এখন যাকিছু করি উচিত অনুচিত সবকিছুই
উটের গ্রীবার মতো সমাহিত—নীরবে
নামতার মতো অভ্যস্ত ও নিয়মমাফিক।

—

দীপন মিত্র

(১৯৫৪)

একলা থাকার মানে

একলা থাকার মানে প্রতীক্ষা করা
যেভাবে গোধূলির বাগান
তার বিশুদ্ধ যুক্তির জন্য
তার দূরাগত পাখিদের জন্য করে

একলা থাকার মানে ফিরে আসা
সুদূর ধূসরতা থেকে ফিরে আসা ,
আবার যাত্রা করা
—অস্পষ্ট বাষ্পীয় যাত্রা সব ।
একলা থাকার মানে মৃত্যুকে ঘৃণা করা
ওড়ার প্রচেষ্টা করা
সমস্ত ঝুঁকি নিয়েও লঙ্ঘন করা
—সন্তান, চুক্তি ও প্রতিশ্রুতি ।

একলা থাকার মানে
শিশুদের স্বাধীন করা
কাঁচা মোম-রঙের পাহাড-নদী-সূর্যোদয়ে ঘুরে বেড়ানো
কয়েক শতাব্দী ধরে
একলা থাকার মানে পৃথিবীকে স্বাধীন করা

অথচ এই একলা থাকা

এক খণ্ড হীরের টুকরোর মতো
রাত্রির মাঝখান থেকে আচমকা
অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে
—হয়ে যায়।

—

অস্ত্র ও বাদ্যযন্ত্রের দ্বন্দ্ব

যদি এখানে এক অস্ত্র তৈরি হয়
কোথাও বাদ্যযন্ত্রও গড়া হচ্ছে ;
এমন সম্ভব নয় যে
একদিকে শুধু অস্ত্রের স্তূপ জমে উঠবে, আর
অন্যদিকে শূন্যতা—
শূন্যতার ভিতর থেকে আকার নেয় বাদ্যযন্ত্র।

বস্তুতঃ কত আলাদা এই দুটি জিনিস ;
অস্ত্র মানুষকে হত্যা করে
বাদ্যযন্ত্র মানুষকে জন্ম দেয়,
অথচ যেখানে কোনো মানুষ নেই
সেখানে অস্ত্র ও বাদ্যযন্ত্রে কোনো বিভেদ নেই,
তারা একে অন্যের মধ্যে বিলীন হয়ে যায়
তারা একে অন্যের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যায়।

শিশুর কাছে অস্ত্র ও বাদ্যযন্ত্র দুই আনন্দদায়ক
হত্যাকারীর হাতে বাদ্যযন্ত্র অস্ত্রের চেয়েও ভয়াবহ
বিপ্লবীর হাতে অস্ত্র বাদ্যযন্ত্রের চেয়েও বেশি সৃষ্টিশীল ॥

উজ্জ্বল সিংহ

(১৯৫৪)

ভাসমান পংক্তিগুলি

১

তাপের বিকীর্ণ বৃন্তে ঝুলে থাকো গ্রীষ্মভেদী আমার বিরহ
নরম নিসর্গ ফুঁড়ে উঠে এসো প্রত্নতত্ত্ব আমার শৈবাল
জলাভূমি দগ্ধ করে জেগে ওঠো কচি ফার্ন আমার ব্রততী
ছিন্নভিন্ন লোকালয়ে নেমে এসো পারিজাত আমার লিরিক

২

দীর্ঘ ছায়াটি ছুঁয়ে আছে ঠিক উঁচু পাড়
শ্রাবনের ধারা বইছে এখনো এলোমেলো
খোঁদলের তলে স্তূপাকার মৃত প্রজাপতি
শামুকের খোলা জীর্ণ ঝিনুক মরা সাপ
রাঙা পাথরের ছড়ানোছেটানো বিন্যাসে
ভাঙা বাঁধটির কোণে ঝুলে আছে দিগন্ত
কাদা মাটি ঘেঁষে চামড়া জড়ানো কঙ্কালে
মাংসের পচা গন্ধ ভাসছে নদীতটে
অকেজো লোহার বিম রড ইট ভেঙেচুরে
ফাটছে আমার মগজের সাদা চুনবালি

৩

অত্যন্ত মেধায় বাঁধি দূর দিগ্‌রেখা
যেখানে আকাশে ক্ষিপ্ত ছটার উপর
গোধূলি ছুঁড়েছে ভেজা মন্ত্রপূত কার
যেখানে প্রকৃতি গাত্রে ধ্বংসলিপি লেখা।

৪

পৃথিবীর প্রতিহত বিচ্ছিন্ন মেধায়
লুপ্ত হতে হতে আমি হারালাম স্মৃতি
নির্বোধ প্রজন্ম পেলো আমূল বিকৃতি
অঙ্গ ও প্রত্যঙ্গহীন ব্যর্থ অভিপ্রায়।

—

[illegible] মেট্রোয়

"ভিড়ের মধ্যে এইসব মুখগুলির ভুতুড়ে ছায়া
বৃক্ষশাখার যেন পাপড়ি"—এজরা পাউণ্ড, মেট্রোর এক স্টেশনে।

'ভূগর্ভের অন্ধকারে আমি এক কম্পমান আলো',
স্যাঁতসেতে টানেলে আজ আমার আবেশ যেন আমাকে শোনালো
করুণ জন্মের গল্প, আমি ঘুম চোখে
বুঝতে পারি কাঁপা কাঁপা শিখার জঠরে
বেড়ে উঠছি ভয়ে, জলস্তর ছুঁয়ে
ভেন্টহোল পার হয়ে উত্থিত হাওয়ার
সাঁ সাঁ শব্দে বেজে উঠলো গ্র্যানিট-সিম্ফনি।

'পরবর্তী স্টেশনের নীল প্লাটফর্মে ফের বেজে উঠবে টুংটাং',
সবুজ কামরার দীর্ঘশ্বাসে দীর্ঘশ্বাসে
দেখি খাড়া হয়ে উঠছে সব রোমকূপ,
পাললিক ক্রাস্ট যেন সর্বাঙ্গে আমার
ছড়ালো শিকড়-রোঁয়া, মাথা তুলে দেখি
কিনিন্ন পাখির মতো জন্মেছি আবার ;

থার্ড রেল ঘুমোবে এখন। সাড়ে সাতশো ভোল্টেজের ঘুম।
ঘুমই জন্ম, ঘুমই মৃত্যু, ঘুমই উত্তেজনা।

—

শব্দ সংকেত

জানলায় খসখস শব্দ, ভোররাতে ঘুম ভেঙে গেলে
খড়খড়ি সপাটে খুলে দেখি ঘন কুয়াশায় ঝাপসা বনভূমি,
কার ভাষাহীন নখে ফুটে ওঠে এমন আঁচড়,
মুহূর্তে ছেড়েছি শয্যা, সিরসিরে হাওয়ারা কাঁধে
তুলে নেয় আমার শরীর।
যাদের নখের দাগ কান্না হয়ে মিশে আছে শুকনো গিরিপথে
তাদের তৃষ্ণার কাছে ঘাড় পেতে দেবো বলে উড়েছি আকাশে।
(তখন বৃষ্টি আছড়ে পড়েছে মহুয়া গাছের শাখায় শিকড়ে।)

ছুঁচলো ঠোঁট ঈগলের হাঁ-করা ঠোঁটের ফাঁকে ঝুলে আছে উত্তুরে বাতাস,
রক্তে ভেসে যাচ্ছে মুখ, কপালে আঘাত করে উড়ন্ত পাথর
স্বর্গ থেকে নেমে আসছে হিমানীক্রুশের নীল কাঠ
তুষারের শৃঙ্গ থেকে নেমে আসছে জমাট শলাকা
পাথুরে শয়তান ফের অনিশ্চয়তার দিকে টেনে নিয়ে চলেছে আমাকে।
অস্তুত একাকী ভোরে কেঁপে ওঠে মগজের স্নায়ু
(ফালাফালা করে ছুঁড়ে দিই নিজেকে ঘন ঝঞ্ঝার ঘূর্ণি-আঁধারে।)

—

আনন্দ দাশগুপ্ত

(১৯৫৫)

জিরো আওয়ার

অনেক দূর থেকে ভেসে আসা জলপ্রপাতের শব্দ
সময় বয়ে যাচ্ছে, পল বিপল ও মিনিট সেকেণ্ড—
যে কোন সময় ভূমিকম্প হতে পারে, অথবা প্রলয়
এখনি ছারখার করে দেবে কিছু। দারুণ আগুনে ফুঁসে
উঠতে পারে আদিম প্রকৃতি!

নিশ্চুপ বনবীথি, থেমে গেছে পাখীর ডাক।
জিরো আওয়ার সন্নিকটে, হাতের মুঠোয়—
শ্বাস চেপে বসে থাকা, টান টান শিরা
জলপ্রপাতের উদ্দামগতি হা হা করে বয়ে যাচ্ছে
রক্তের ভিতর।

শুধু তার শব্দ।

—

কাঠুরেরা

কাঠুরেরা আমার বুক চিরে নেবে গেছে
বহুদিন আগে।
তারা চিনে নেয়, চিরে নেয়, আর্থিক মহিমাভরা
সেগুনের কাঠ।

আমার ভিতরে, বুকের ভিতরে যার প্রশাখাময়
দীর্ঘ বিস্তার।
যার আলোছায়াময় বিরাট ঘনত্বে আন্দোলিত আমি।
যার শিকড় আমার স্নায়ুতে, মেদে, মজ্জায়
করেছে বাসা।
কাঠুরেরা নেমে যাক
বুকের ভিতর
চিনে নিক দীর্ঘতর সেগুনের কাঠ, যার নাম আমি জানি
কাঠুরে জানেনা।
আমার সততা, স্নেহ, বিশ্বাস আর প্রসারিত
ভালোবাসা।

—

ডায়েরী

আমার দিন কেটে গেছে বসন্তের ডাক শুনে,
আমায় জানালায় এখন শীতের বাতাস করছে খেলা
আমি গ্রীষ্মের শুষ্কতা যতো জড়ো করেছি গতকাল,
আমার বসবার ঘরে,
হেমন্তের রাত্রিদিন বয়ে গেছে আমার স্বপ্নের ভেতর।
আমি একা বেঁচে আছি নদী আর পৃথিবীর খুব কাছাকাছি।
ঋতুর খেলা শেষ। আমারই মতো জানি,
শেষ চিঠি ডাকবাক্সে কে জানে কার।
তোমার মুখের আদল নড়েচড়ে এ পড়ন্ত বেলায়।

অনাথবন্ধু চট্টোপাধ্যায়

(১৯৫৭)

বসে আছি হে

কোন্ স্টেশনে খবর দেব
নিখোঁজ হয়ে গেছে পরান বন্ধুরে
কোন্ স্টেশনে খবর দিলে
বন্ধু আমার
সুখের সাঁঝে ফুটিয়ে দেবে আশার তারা।

শিশির ভেজা রাত পেরোলো,
সূর্যি জেগে এগিয়ে এলো,
কোকিল ডেকে শুধিয়ে গেল কথার কথা।

গরম দুপুর শিস দিলে ঐ ঝটকা হাওয়ায়
শব্দ ওঠে—
দরজা খোলো—দরজা খোলো—দরজা খোলো—
হায়রে কপাল—
বিরহী এক মেঘলা বাতাস মনের কান্না শুনিয়ে গেল
দুয়ার খুলে!

তাই জল থৈ থৈ—জল থৈ থৈ—চোখ যমুনা।
ঝরবে নাকি ফুটিয়ে রাখা প্রাণের পলাশ,
তবু মনের বনে হরেক পাখির আনাগোনা।

—

যায়

কুটুস কুটুস কাটিস।
কতই না তুই খাটিস।
কাঁথাটা যায়,
কাপড়টা যায়,
আঁচলটুকু রাখিস।

লজ্জা শরম ভরম
সবই আছে চরম।
বাঁচতে হবে
লড়তে হবে
সাচ্চা রেখে ধরম।

ইচ্ছে যা হয় নিস
দাঁতের ধারে দিস।
গাঁ গিয়েছে
মা গিয়েছে
পুড়ছি অহর্নিশ।

—

অ-মানুষ

নিন্দেমন্দ করিস
জানিস না তো দেহের ঘরে
লুকিয়ে আছে খরিস!
যখন তখন তুলতে পারে

ধুলোর পারা কণা,
রগচটা ও বদখেয়ালী
নাইকো হিতৈষণা।

শোন্‌লো প্রতিবেশী
হাসতে পারি লোক দেখানো,
অথচ নয় হাসি।

শোন্‌লো দুখী সই—
সুখ পেয়েছি বড়ো,
তাই সঠিক মানুষ নই।

—

রজতকিশোর দত্ত

(১৯৫৮)

স্বপ্ন

আমরা হাঁটছি
কোথায় যাচ্ছি, জানিনা
তবে, আমার সঙ্গীদের মুখে
চিন্তার ছাপ,
দেখে মনে হয়
আমাদের ভিতরে হয়ত কোনো
অসুখ বাসা বেঁধেছে
জীবাণুরা ক্রমাগত বেড়ে-বেড়ে
ঢেকে দিচ্ছে আমাদের শরীর ;
ছায়া-ছায়া একটা বিকেলের মধ্যে দিয়ে
আমরা হাঁটছি
দূরে অফিস ভাঙছে, উপচিয়ে পড়ছে মানুষ
চারিদিকে ট্রাফিকের চীৎকার, তবুও
আমরা হেঁটেই চলেছি, অনন্তমনে।
আমাদের বুকের ভেতর
শুকনো গাছের ছায়া, ঝরা পাতার রাশি
অনেকগুলো বাসি মুখের ছাপ, আর
আমাদের মাথার ভিতর
অনেকগুলো আবছা সন্ধ্যার কবিতা
থমকে রয়ে গেছে, একা-একা, আলাদা-আলাদা

—

থেকে যাই

থেকে যাই আরো কটা দিন
ক্লান্ত কাকের মতো, অন্ধকারে
সন্ধ্যার শিবিরে ;

উন্মাদ মানুষের দল
আমার চারপাশে
চারিদিকে অজস্র চীৎকার
আমাকে ঘিরে থাকে রাত্রি-দিন ;
তবুও থেকে যাই আরো কটা দিন,
আরো কটা দিন এখানেই থাকি
একা-একা, চুপি-চুপি
নিজস্ব কবিতার মতো
পায়ে হেঁটে-হেঁটে, পায়ে হেঁটে-হেঁটে
শরীরে আমার নিঝুম রাত্রি ;

তবুও থাকি, যেন এই অশান্ত পৃথিবীতে
সন্ধ্যার শিবিরে
ক্লান্ত কাকের মতো
আরো কটা দিন, অন্ধকারে।

—

সুব্রত রায়

(১৯৫৯)

অনির্বাণকে

অনির্বাণ কেমন আছিস অনির্বাণ
অনেকদিন হলো কোন যোগাযোগ নেই
তোকে মনে পড়ছে খুব
মনে পড়ছে বার বারই মনে পড়ছে
তোর সেই অপাপবিদ্ধ চোখ যা দিয়ে একদিন
গর্ভবতী ধানগাছ ঘাসফুল রোদ
মাটির সোঁদালো গন্ধ পাখির হৃদয়
স-অব সব জেনেছিলি একমাত্র তুই

আমি
ডানাকাটা জীবাত্মার মতো চিং হয়ে
আজও শুয়ে থাকি প্রৌঢ় অপরাহ্ণ মেখে
ফসিলের মতো
ছয় বাই চার সেই নিজস্ব উঠোনে
অনির্বাণ তাই
তোর ছোঁয়া রোদ্দুরকে ছুঁতে পারি কই

আজকাল কোথায় থাকিস তুই
সেখানে কি—
শেষ হেমন্তের রোদ আদিগন্ত শুয়ে থাকে সুগন্ধী মাটিতে

অনির্বাণ একটিবার আয় এই আমার উঠোনে

আমরা সবাই মিলে রোদ বা শিশির খুঁজি আর
আর খুঁজি আমাদের নির্মল সকাল।

—

আশ্চর্য ভূমিতে আমরা

লোকালয় ছেড়ে দেবো লোকবৃত্ত তাও
আমরা চলে যাবো
চলে যাবো সমুদ্রযাত্রায় কোন আশ্চর্য ভূমিতে

সেইখানে অন্ধকারে আলোর প্রয়াসে
শিকড় ছড়িয়ে দেবো ডালপালা ছড়াবো
লতাতন্তু জড়িয়ে নেবো সর্ব অবয়বে

নিঃশব্দ চুম্বনে টানবো ভূমগ্ন শিকড়
পুষ্পিত প্রশাখা দুলবে প্রসন্ন আমোদে

দৈবাৎ কখনো কোনদিন যদি ছুটে আসে
বেয়াদপ সামুদ্রিক ঝড়
আমরা উর্ধ্বশির বলবো আকাশ ও মাটিকে
আকাশ
আমরা তোমার কাছে নতশির
ঝড়ের কাছে না
মাটি
আমরা তোমার বুকে
বীজ ছড়িয়ে দেবো
ঝরিয়ে দেবো ফুল
একটি চুম্বনও আমরা ঝড়কে দেবো না।

—

অভিজিৎ মুখোপাধ্যায়

(১৯৬০)

ঘরে ফেরা

শোনো, বহুযুগ পরে আমি এখন ঘরে ফিরছি।
দরজাটা খুলতে গিয়ে একটা যুগের
প্রয়োজন হলো। শব্দগুলো ছিটকে সরে গেল,
উড়ে গেল এবং ফুরিয়ে গেল
শ্বাসকষ্টের মত ঘূর্ণিঝড়ে। শোনো
তোমরা কে কে বেঁচে আছ তার হিসেব
রেখে যাও, তোমাদের কণ্ঠস্বর, আকৃতি,
অন্তর্গত প্রার্থনা সব কিছু জেনে নেব
সারারাত পারাপারের পর।

কবিতার রাজ্যে তোমরা কে কেমন আছ ?
ভালোবাসছ ? নাকি অবিশ্বাসী খেলার শেষে
ভ্রান্ত সম্মোহনে তোমরা গোলাপ ফোটাতে
পারছ না একটাও ? মায়াবী ডিঙ্গি
আর তার মাঝি তোমাদের দিয়েছিল
ক্লান্তি উপহার।—কেঁদেছ ? নাকি
জন্মান্তরের কথা ভেবে ক্ষয়িত হয়েছ বারবার ?
শোনো, ভালোবাসার জন্যই স্বর্গের সরোবরে
পদ্ম হয়ে ফুটেছিল স্বপ্নের পাখীরা···
কবিতার শরীরে তোমাদের শরীরের ঘ্রাণ
ফুটতে দেখব এবং অলৌকিক মুদ্রায়

রোদ্দুরের দিকে হেঁটে যাব। শোনো
বহুদিন পরে আমি এখন ঘরে ফিরছি।

—

টেরাকোটা

বিকেলের ডাকে চিঠিটা এসেছিল : অসতর্ক মুহূর্তে
হু হু ক'রে বয়ে গিয়ে অনন্ত সময়, চুপি চুপি বলে :
মানুষে বিশ্বাস রাখ, অনিবার্য হাত রেখে
যাচাই ক'রে ফেরো—তুমি তাকে দেখিয়ে দাও
শিকারে শিকারীর দুর্বলতা এবং হাহাকার—
আবহমণ্ডলে ঝড়ে উড়ে যায় ঈপ্সিত বাসনা।

আদিম পিপাসা ছুঁয়ে অন্তহীন ওঠে চিৎকার
বুকের নির্জন মাঠে যেখানে তোমার স্থান নেই
গভীর তিতিক্ষায় নিঃসঙ্গ সেতারীর ব্যথিত আঙুল
যেন আঁচড় কাটে হাওয়ায়। সেখানে নীরবতা।
তোমার সুস্থতা জানিয়ে চিঠি আসে সকালের ডাকে
বিকেলের ডাকে চিঠি বলে : নবান্নের ঘ্রাণ নাও।

কেউ কোনো কথা বলেছিলো ম্লান হেমন্তের দিনে
বাতাসে আকালের গন্ধ পেয়েও সাধ হয়
উড়ে যাই, নিজেকে ছড়িয়ে দিই প্রতিশ্রুতি মাঝে
কেউ কিছু বলেনি বলে ইচ্ছে হয় সান্দ্র অনুভবে
অন্ধকার ঝরে গিয়ে আমাদের বুক ছুঁয়ে যাবে
বসন্তকালীন কিছু ভালোবাসা এবং তার অনুষঙ্গ
আমার অনুভূতি বলে : ঝরা পাতাগুলো আজ
কেন্দ্রিত হোক তোমার টেরাকোটা দেউলে।

—

অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়

ঘর

ঘর এখন নির্জন,
আমি একা।
মাথার উপর স্বর্গের পরীর মতো শুভ্র ডানা মেলে
জেগে আছে শীতকাতর মায়াবিনী ফ্যান।
বিছানায় অদ্ভুত এক মলিনতা,
পোড়া সিগারেট, দেশলাই কাঠি, অসতর্কে পড়ে যাওয়া
ভাঙা ছাইদান।
বন্ধ জানালার নীল বুকে হলুদ পর্দা
বিবর্জিতা একা প'ড়ে রকিং চেয়ার
রাত্রির আশায় মাথা হেঁট করে ফ্লোরোসেন্ট বাল্ব,
ক্যারামবোর্ডের খোলা চোখ
আলমারীর আঙুল ধরে ঝুলে আছে ক্লান্ত খোলা তালা—

এসবের ভিতর আমি একা
কিংবা একা নই
অ্যালবামের ভিতর অজস্র অপরিচিত লোকের বোবা মুখ
শব্দহীন হাসি
বুকে প্রচুর প্রতীক্ষা নিয়ে নেমে গেছে সিঁড়ি
আহত বিশ্বাস নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে দরজা
বহুকাল কেউ যে আসেনি,
কে আসবে?

গম্ভীর প্রশ্ন নিয়ে চারটে দেয়াল।

ছবিতে যীশুমাতার আদর খাচ্ছে অন্য এক শিশু
হেসে আছে টেবিল-লাইট,
বুকে বহু পদধ্বনি নিয়ে, ঘুমে ক্লান্ত
জানালার তাকে-রাখা অপ্রয়োজনীয় পাপোস।

আমি একা, মুখের উপর ঝুঁকে আছে ভবিষ্যত, সমস্ত জীবন।

—

সঞ্জীব নিয়োগী

পেত্রার্কীয় সুখ দুঃখ

২৩.

গভীরে নেই ধানের শুঁয়ো এখন কেবল ভঙ্গী আছে
ঠিক যেরকম হাতছানি দেয় অন্ধকারে অকাল-ছুঁড়ী
ধুলোঝাড়া চার দেওয়ালে উপন্যাসের রক্ত ঝরে

উই কেটেছে শেকড়বাকড় ঝড় বিমূখী দাঁড়িয়ে আছি
কিংবা আপাত চিকন আছি প্রত্যাশী ছায়া পড়ছে কাছে
গভীরে নেই ধানের শুঁয়ো এখন শখের রক্ত ঝরে
রক্ত ঝরে খেলার ঘরে, নয় কদাচিৎ পাখির নীড়ে
সেই সুবাদে দুঃখ সুঃখ বেচছে বসে কে জানি কে।

বিঘৎখানেক জমি ছিল আমার হিসেব-বহির্ভূত :
শীত দুপুরে তিতির বসে, এখন সেটা বুঝতে পারি।
কোথায় তারা দাঁড়িয়ে গেছে হিসেব করা হল্‌কা ছুতোয়
এই এতদিন পরে এখন হাওয়ায় ঝাউয়ের পাতা নড়ে।
উই কেটেছে শেকড়বাকড় এবং আপাত চিকন আছি
অন্ধকারে অকাল-ছুঁড়ী : ধানের শুঁয়ো নেই গভীরে॥

—

২৫.

এমন বাতাস অথচ ভুলনা চিত্তহীন
আমিও স্বপ্নে দেখেছি ময়ূর, ভাঙা আকাশ
উদাস এ রঙে গল্প মেলাল ঘোর চাষা
তবু ছেঁড়া রাত কঁকিয়ে ওঠেনি যন্ত্রণায়।
সেই মেয়ে কখনও এমন হাসি তো জানত না
তবে কি ছলাৎ বালির উপরে এই আসা
তবে কি রৌদ্রে শিশির জমেনা এই ঘাসে?
তাই ছেঁড়া রাত কঁকিয়ে উঠবে যন্ত্রণায়!

ভোরের শব্দে যদি সে ব্যাপারী জাগেই বা
আমার মিহিন ব্যথায় দেবেনা আল্পনা।
তোমরা আমাকে রাস্তায় ফেলে মুখ লুকাও
কে দিল তোদের স্বার্থপরের এই চাবি?
আমি কি তাহলে কোথাও একটু দাঁড়াইনি!
ভালোই আমাকে জমাস গলাস, কামময়ী॥

—

পার্থসারথি উপাধ্যায়

বাদর

মধুমিতা, কি দারুণ কালো আকাশ আজ
সবুজ আলোর মতো জলজ কুয়াশা ঝরেছে সারারাত—
সারাদিন
মনের শহরে শুধু তোমার আঘ্রাণ ভাসে।

জোনাপরির অঙ্গে হলুদ পোশাকের মতো আলো
আর কেঁপে নামে অজস্র চুমুর মতো অন্তরঙ্গ রিমঝিম

কি দারুণ কালো আকাশ আজ।

তুমি আঙুল ছুঁয়ে দাও, কী দারুণ শীত জমে যাবে
তুমি নিঃশ্বাস ছুঁয়ে দাও আমি নীল আগুনের মতো জ্বলে যাব
আর তখনি মনে পড়বে, একদিন বলেছিলে
কবিতা মানে রেলপাঁচিলের ধারে
টাবুলের ঠোঁটে ঝিংকুর ভীরু ছোঁয়া।

—

ঋতুপর্ণ গোস্বামী

যাত্রা

আর হয়ত ফেরা হবেনা।

স্মৃতির তোরঙ্গে গুছিয়ে নাও
সবুজ শৈশব, অসমাপ্ত পাণ্ডুলিপি
চারিপাশে ছড়িয়ে থাকা
ছোটখাট ঘটনা,
খিড়কিতে হুড়কো আর
সদরে তালা দিয়ে
দুর্গা দুর্গা স্টেশনের দিকে।

পড়ে থাক তুলসীতলা,
সবুজ ছায়ামাখা পুকুর,
নারকেল গাছ, গরুর জাবনা।

দুপুরের শান্ত রোদ্দুরমাখা
ভিটের কান্নাকে ছাপিয়ে
ট্রেনের ঝমঝম শব্দ
কুঠারের মতো কেটে ফেলুক
হৃদয়ের অনেক গভীরে
জড়িয়ে থাকা শেকড়বাকড়।

—

গন্তব্য

আর কয়েক পা এগোলেই শিমূলতলার বাঁক।
সামনে শান্ত রোদ্দুর,
পেছনে ঝরাপাতার দীর্ঘশ্বাসমাখা
ফোঁটা ফোঁটা অন্ধকার গড়িয়ে আসে।
ক্লান্ত ঘামে ভেজা ভারী বোঝাটাকে
ধুলোর ওপর নামাতে গিয়ে দেখি,
আমার প্রতিটি শিরা উপশিরায়
নীরবতার পুকুরে ডুব দিয়ে
কালো চুল এলিয়ে
ভিজে পায়ে সন্ধ্যা নামে।
হঠাৎ মনে পড়ে
প্রসন্ন গুরুর পাঠশালা থেকে দুটি অবাক চোখ
গ্রামের ধারে আতুরী ডাইনীর বাড়ি ছাড়িয়ে
শিশির ভেজা তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে
ব্যাঙমা-ব্যাঙমীর দেশে
সোনালী মেঘের পর্দাঢাকা
ফেরেস্তাদের দরবারের দিকে তাকায়।
নবীন রক্তের উষ্ণতা যখন
ঝলমলে রোদ্দুর দিয়ে ভিটের শেকড় কেটে
প্রাণের রাস্তা পেরোয়—
আব্বাজান বলেছিল,
শিমূলতলার বাঁক পেরোলে তুইও দেখবি
সোনালী মেঘের আড়ালে
ফেরেস্তাদের দরবার নয়,
রয়েছে সূর্যাস্তমাখা নিঃসঙ্গ একটা
মকবরা।

—

অবনীশ বসু

ওরা কত কাজ করে

ওরা হোহো করে হাসে
আর হাউ হাউ করে কাঁদে,
মোটা সেদ্ধ-চালের ভাত খেয়ে,
মাগ-ছেলের হাত ধরে রথের মেলায় যায় ;
ছেলের হাতে দুটো পাঁপড় ভাজা
বৌয়ের আঁচলে মেটে সিঁদুর, আর চুলের ফিতে।
সন্ধ্যেয় ফিরে
দাওয়ায় বসে মনসা মঙ্গলের গান।,
না বেদান্ত দর্শন, না নৈর্ব্যক্তিক নিরানন্দ।

লেবু ফুলের গন্ধ মিলে
দা-কাটা তামাকের সুবাস
আঙিনাতে ম-ম করে।
ও আবের খাঁ, ও নিতাই দা, কোথা যাও!
একটু তামুক খেয়ে যাও দিনি!

ঝুড়ির তলায় পাতিহাঁসগুলো খুনসুটি করে,
পুকুর উপচে পড়া জল
ছপ ছপ ক'রে ক'রে
কুকুরটা জোনাকিগুলোকে ধমকায়।

রান্নাঘর থেকে পাতা পোড়ার শব্দ,

মুলোর মাচি আর লাউতলার ঝুরঝুরে বাঁশ
রাতের অন্ধকারে কি আবালে,
ওদের পেঁপিকে থরথর করে কাঁপায় ;—

কাল সকালে জল থই থই মাঠ,
ওদের লাঙলের ফালে
উথালি-পাথালি হবে।

—

দীপক সেনগুপ্ত

মৃত্যুদণ্ডাদেশ

প্রতিদিন এক একটি শিশুকে
খুন করতে হয় মনে মনে
আমাকে বড় হয়ে উঠতে হয় প্রতিদিন।
বড় হয়ে বড় হয়ে···বুড়ো হয়ে উঠতে হয়,
তারপর মনে মনেই
হাঁটু মুড়ে বসতে হয় একদিন
সেই কষ্টের একদিন
সামনে থাকে—গুরু নয়—ঈশ্বর নয়
এমনকি আদর্শও নয়
শুধু "কফিন",
আমার নিজে হাতে হত্যা করা
হাজার হাজার শিশুর কফিন
আমাকে তাদের সামনে নতজানু হতে হয়,
তবুও ক্ষমা মেলে না
নিয়তি আমার অপরাধের শাস্তি দেয় অমোঘ
মৃত্যুদণ্ড।
আমাকে ওদের মধ্যেই মরে যেতে হয়
ওদের সঙ্গে একই সাথে
কবরস্থ হই আমি।

—

তপন সেন

পেছন ফিরে তাকালেই

এখন আর পেছন ফিরে
তাকানো যায় না
অনেকটা পথ একলাই
চলে এসেছি,
এখন পেছন ফিরে তাকালেই ।

কখন যে খিড়কির দরজা খুলে
বাইরে এসেছি,
কেউ জানে না ।
কখন যে ছায়ায় ঘেরা গ্রাম
দূরে ফেলে এসেছি,
কেউ জানে না ।

এখন এক বুক আগুন নিয়ে
পেছন ফিরে তাকালেই
আমার পথ রোধ করে
সেই এক উজ্জ্বল সাদা পায়রার ঝাঁক ।
এখন পেছন ফিরে তাকালেই ··
এখন আর পেছন ফিরে
তাকানো যায় না ।

ছেড়ে গেলে পরিচিত বাস

আমায় দিও একটুকরো স্মৃতি
তোমার সমুদ্র-সময় থেকে ;
আমি চলে যাব একদিন
অন্য কোন একান্ত সীমানায়।

তোমার জন্য রেখে গেলাম
খেতখামারের ফসল
আর ভালোবাসার নিরপেক্ষ নদী
তুমি থাকবে তাই নিয়ে।

হলুদবনে মাতাল হাওয়া কখন যে
গেছে থেমে কেউ জানেনা
এখন আর উর্ধ্বমুখ চাতকের মতো
চেয়ে থাকা নয়।
এইবার ছেড়ে গেলে পরিচিত বাস
শুধু দূর থেকে নেড়ে দিও রেশমী রুমাল

—

ফেরারী

সময়ের মাঠ ভেঙে হেঁটে যায় ইদানীং
একাধিক কুঞ্চিত লোক, প্রতিদিন,
ছায়া-ছায়া বিশীর্ণ বিকেলে।

সবুজ আলোর গন্ধ গভীর নিঃশ্বাসে

ওরে নিয়ে জেগে চলে স্বপ্নের গভীরে
নিম্নবিত্ত নিঃস্ব সকালে।
আবার বিকেল হলে,
হঠাৎ তীব্র এক অনিবার্য নদী
পাড় ভাঙার শব্দ আনে।
অথচ তখন সেই একাধিক ক্ষুধিত লোক
পথ খোঁজে সবুজের মাঠ ভেঙে,
অভ্যাগত, অজানা শিবিরে।

সেইসব নামহীন অবসন্ন লোক
এক সুপ্ত মাঠ ভাঙার ক্লান্তি নিয়ে, অবশেষে,
ঘুমাতে কোথায় যেন ফেরারী এখন।

—

বিভাস ভট্টাচার্য

স্মরণ

শস্যখেত দূরে। হলুদ সরষে ফুল।
স্মৃতির সরণি, ফুল ফোটে, দূরান্তৃত পথে।
কিশোর বালক যাবে কোন গাঁয়ে, দিগন্তের
অন্ত এক আকাশের কোলে। পায়ে পায়ে
পথ শেষ হয়। ধূসরিত পথ, বিকালের পড়ন্ত-
ছায়ার মায়াময়।
বিমুক্ত স্মরণ, ফুটে থাকে সরষে ফুল,
বিস্তীর্ণ প্রাণের প্রান্তরে।

—

স্বপ্ন

বেলা শেষ ভূগোলের, গাছের পাতায়
পাহাড়ের শেষে প্রান্তর যেখানে ঘুমায়,
রোদের আরাম। তারপর ঘনাবে আঁধার
মায়ার পরিধি পারে। তারও পরে হবে
সূর্যোদয়—
লক্ষ লক্ষ শতাব্দীর পরে। সে সূর্যের সাক্ষী
আমি নয়।

সাক্ষী হবে সে কোন্ আতক, আহ্বক পারের কোন্ যাযাবী বালক। হোক তৃপ্ত, হোক সুখী, হোক সে পৃথিবী হাস্যময়, জীবনের মাধুরীতে ভরা। অস্ত বেলার করুণ বেহাগ, স্বপ্ন দেখে প্রভাতের আনন্দ-ভৈরবী।

—

রসময় সেনাপতি

স্বীকারোক্তি

যত দিন যাচ্ছে অন্ধকার গাঢ় হচ্ছে ;
মুছে যাচ্ছে সকালের সিঁথির সিঁদুর।
লাল বেনারসী রঙ আঁধারে অদৃশ্য,
বেয়াড়া সময় তাল ঠুকে, কদাচ বশ্য।
অথচ এসব কিছু আমারি দখলে,
বদলে দেব দুনিয়ার হাসিকান্না
আনমনা ছড়ি হাতে নিঃশব্দ সঙ্কেতে।
এখন শিথিল পেশী লোলচর্ম হাতে।
কে বদলায় ? সময় ? অথবা নিজেকে
তিলে তিলে জাল বুনে আটকে ফেলেছি
নিজেরি অজান্তে এবং ;—অথচ পলাশ
ঠিক সময় হাজির, রোদ খায় ঘাস।
ধৃতরাষ্ট্র সমাপন্ন জীবন বলয়
জীবনের কুরুক্ষেত্রে সময় সঞ্চয়।

—

শরীরের শিকড়ে

শরীরের শিকড়ে আজ আর মাটি নেই
শুধুই সিমেন্ট বালি পাথর
এবং অবশ্যই রঙিন খেলনার রকমারি ভাগাড়

দুখ শুধু রক্তের রূপান্তর।
জ্যাঠা কাকা ভাই ভাইপো ইত্যাদি
নানা সম্পর্কের স্বাদগন্ধ
নাগাল পাই না তাই
বটের বুক চিরে ঝুরি নামে না মাটিতে।
ঘাটে শুধু শ্যাওলারা পদচিহ্নহীন,
ঝিঁঝি মাসি পরাণ খুড়োর সঙ্গে
পরামাণিক দিদির দল
কখন দলছুট অবহেলায় অথবা অতর্কিতে।
আপাততঃ হে সঞ্জয়
মাটিহীন এই জীবন
এখানেই যথার্থ পরাজয়।

—

সুজাতা সিংহ

টাউনের গাছ

রাস্তা এসে উঠে পড়েছে গোড়ায় শিকড়ে
পান বিড়ি সিগারেট কয়া লাল দাগ
ভাঙা টিনের শেড কেটে বসেছে কাণ্ড
গাঢ় রসে ভেজে ধুলোজমি।

টাটার জন্মদিনের রাত্তিরে
টুনি বাল্‌বেরা ওর শরীর ছুঁয়েছিল
পত্র রোমরাজির নীচে জমে আছে কার্বনের গুঁড়ো

প্রবাসী পাখীরা সকালের আলোয়
এক ঝলক নেচে ফিরে গেছে
বাতাসের মলিন ঝাপটায়
এখনও এক একবার চমকে ওঠে
টাউনের গাছ।

—

অমরতা চাই

যে কোনদিনও ছিল না
কখনও ভালোবাসেনি
তার প্রতি অভিমানে

আকাশে মেঘ জমেছে
ফোঁটা ফোঁটা জল
ঝরে পড়বে দেবদারুর বনে
প্রেমের বিন্দুগুলি ওখানেই থাকে
মেঘলোকে বসতি করে
ক্বচিৎ স্বাতী নক্ষত্রের জল নিশিরাতে
নামে তৃণের পাতায়
মাটি আকণ্ঠ পান করে জলবিন্দু
চাপা কুয়াশার মতো
ভালোবাসার সুগন্ধ ভাসে ঘ্রাণে
ওর অমরতা চাই।

—

স্বামী সোমেশ্বরানন্দ

নায়কের প্র.বশ ও প্রস্থান

জন্ম

সেই ছোটবেলা থেকেই
আমি বন্দী-যন্ত্রণায় অস্থির
বলেছিলাম :
অসূর্যম্পশ্যার চোখে হাজার সূর্যের খেলা
আমায় তৃষ্ণার পানীয় দাও
হে ঈশ্বর।

জীবন

মনে হচ্ছে রত্নপুর সোজনবাদিয়ার ঘাট
সব এক এক করে পার হয়ে চলেছে ট্রেন
অথচ জানি রাজধানী এক্সপ্রেস এসব কিছুই পার হয়না
তবু ভালো লাগছে
মনে হচ্ছে
ভাবছি—
পরের স্টেশন নিশ্চয়ই নিশ্চিন্দিপুর।

মৃত্যু

পথ কে রুখবে বলো? আমি আজ
আমি আজ স্বয়ংই নায়ক

কেননা জলের স্রোতে আমি আজ রাখিয়াছি হাত
এ দূর প্রবাসে
জীবনের পথে জমা আমার এ সঞ্চিত আশ্বাস
আমার সমস্ত আশা সীমাবদ্ধ জলের প্রবাসে
অথচ নিজস্ব ঘর, দ্বীপ, থাকে সকলের
রাক্ষসের মতো মুখ কাছে থাকে জানি,
তবু তারা দেখবে না, তুলে নেবে জাহাজ-মাস্তুল
বন্দরের ডাক ছেড়ে দূরে যায়, আনাড়ি নাবিক—
চলে যায় প্রবাসেতে
'বাড়ি আছে ?' এই ডাক শুনে।

—

অচিন পাখী

জনারণ্য। নাগরিক ইজেলের বিবর্ণ ছবিতে
এই মন এই মুখ,
একা-একা মাটি গুলে গুলে
দেখেছি সে নীলকণ্ঠ রঙ, জীবনের প্রতি ধারাপাতে
প্রতিমা গড়েছি আমি সাগরের কোন্ ডাক শুনে।
করতলে সুধাহত সাজানো নীড়ের অবশেষ
শূন্যতায় অস্থির আমি স্বরচিত সুখের সন্ধানে।

(চোদ্দ বছরের ছোট ভাইটার মৃতদেহ ফেরত পাবার জন্য
এখনও আমি জেল-গেটে প্রতীক্ষায় বসে
অথচ সার্ত্রে'ই নাকি অস্তিত্ববাদী
কি বিড়ম্বনা, দেখুন আপনারা।)

বাউল, বাউল তুমি, একতারা কোলে তুলে নিয়ে

তুমি কি আকাশ খোঁজ ?
খুঁজে কের সারাটি জীবন ?
তোমার বুকের মাঝে হীরামন ডানা ঝাপটায় ?
আমার হাতের মাঝে শুধুই সূর্য খেলা করে
অথচ মুনিয়া পাখি বুকের মধ্যে সারাদিন
ডানার ঝাপট মারে শঙ্খচিল ঈগলের মতো।
কেউ চেনো ?   কেউ চেনো একে ?
এই রঙ, এই ডানা, মাথায় রঙিন ঝুঁটি তার।

—

সুরজিৎ বিশ্বাস

এই আছি বেশ

পেঁজাতুলো মেঘ, ধনুকের মতো দিগন্তে ছড় টানে
পক্ষী-শিকারী যত অন্বেষা, ব্যাধবেশী খাড়া সৈনিক ;
কৃষ্ণ পিপাসী দখিনের চোখে খুশী ঝলমল তারা
মন্দ লাগে না, গোপন বরণে বকুল-বাসনা দৈনিক।

কীভাবে, কখন, পেঁজাতুলো মেঘ তুরন্ত ঝড় হয়
বর্শাফলার বর্শাঘাতে নয়নের মণি-কোঠায়,
মহাভারতের কৃষ্ণ উধাও, ভারতের রাধা কাঁদে
কাকে ফেলে আজ কাকে সে ওপরে ওঠায় ?

এই আছি বেশ, মন্দ লাগে না পেঁজাতুলো মেঘ নিয়ে
চরকা কাটতে বুড়ি হ'লে কেন হাতটা বাড়াবো চাঁদে ?
কাজের মানুষ, ছেলে-বৌ নিয়ে খেটে খাই, বেশ আছি,
স্বপ্নে-টপ্নে পড়তে চাই না, আকাশ-কুসুম ফাঁদে।

—

ও তো হাসে, সবুজ ঘাসে

এই সোনামোড়া রোদ্দুর পেয়েও
সোনার অঙ্গ শাড়ির ছায়ায় ঢাকি ;
আবরণ তো ওরও ছিল প্রচুর

পাপড়ি খুলে 'মুক্ত' হওয়া, উচিত না কি ?

অলঙ্কারের অহংকারে, শরীর যখন
সঙ্কুচিত ; লজ্জা তখন সে-যৌবনের ভার
ও তো হাসে সবুজ ঘাসে, গাছ-গাছালি
নদীর জলে, পাহাড়ে বারংবার ।

সঙ্কোচ আর সঙ্কোচনের চিহ্ন কোথাও নেই
কোথাও নেই অমর্যাদা, রূপের অপহরণ ,
সোনার অঙ্গ শাড়ির ছায়ায় লজ্জা দিয়ে ঢেকে
ভালোবাসতে গিয়েও আছে মধ্যপথে মরণ ।

ওর তো ওসব বালাই টালাই নেই
আপনি মত্ত আপন রূপে রঙের অনুরাগে
ভালোবাসায় নেই দ্বিধা, নেই প্রার্থী নির্বাচন
ভাবেও না ও, প্রেমিককে তার দেখতে কেমন লাগে ।

—